Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

আওয়ারা

শফীউদ্দীন সরদার

রোকন

বইঘর

আওয়ারা

www.boighar.com

আওয়ারা

www.boighar.com

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
www.boighar.com
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বই ঘর

আওয়ারা
শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪

প্রচ্ছদ www.boighar.com
রাজু আহমেদ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
www.boighar.com
মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0063-4

AWARA : By ShafiUddin Sarder
Published by : S M Aminul Islam. **BhoiGhor :** 43 Islami Tower
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** February 2014 © by the publisher

Price : 180 Taka only

উ ৎ স র্গ

আমার মেয়ে

শাহনাজ বেগম বেবীকে

ঢাকাতে সাহিত্য কাজ করতে গিয়ে

যার উপর বেশি নির্ভর করেছি–

www.boighar.com

–শফীউদ্দীন সরদার

আওয়ারা

সফিউদ্দিন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

আমাদের কথা

সমগ্র মানব জাতিকে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দিয়েছে ইসলাম। বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসার হয়েছে তার সৌন্দর্যের কারণে। বিদ্বেষীরা বলে, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় শক্তি প্রয়োগের কথা; কিন্তু ইতিহাস বলে, ইসলামের প্রসার হয়েছে কেবলই তার সৌন্দর্যের কারণে। শাশ্বত জীবন-বিধানকে জেনে বুঝে যারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করেছে; তাদের অসাধারণ সুন্দর জীবন-যাপন পদ্ধতি দেখে বঞ্চিত পথহারা মানবাত্মা পতঙ্গের মতো ছুটে এসেছে ইসলামের সুমহান ছায়াতলে। ভাগ্যবান আরব ভূখণ্ডের অনেক পীর, মাশায়েখ এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার করে গেছেন। রাজা তাঁর রাজত্ব ছেড়ে ছুটে এসেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীনের দাওয়াত নিয়ে। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসটি তেমনি এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র নির্মাণ করেছেন প্রবীণ কথাশিল্পী শফীউদ্দীন সরদার। লেখক এখানে ইতিহাসই তুলে ধরেছেন গল্পের ঢংয়ে, বাস্তব চরিত্রের রূপায়নে।

চাপাপড়া ইতিহাসের কংক্রিট দরোজা যেসব দরদী ঐতিহাসিক নিপুণ হাতে সাহিত্যের হাতুড়ি-শাবল চালিয়ে আলগা করেছেন তাঁদের অন্যতম এক দক্ষ কারিগর শফীউদ্দীন সরদার। আল্লাহ তায়ালার কাছে হাজার শোকর, বর্ষীয়ান এ কর্মবীরের শেষ কয়েকটি বই আমরা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। এ শুধু আমাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসা আর দোয়ার বরকতেই সম্ভব হয়েছে।

www.boighar.com

প্রায় দুইশ' বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত এই উপমহাদেশের সত্যিকার ইতিহাসের উপর যতটা অবিচার হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জনপদে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এখানে হিরোকে জিরো আর খলকে

হিরো বানিয়ে পূজা চলেছে অনেক। সাম্রাজ্যহারা মুসলিম জনগোষ্ঠী শুরু থেকেই বৃটিশদের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় এই দুইশ' বছর ছিলো কেবলই মুসলমানদের জন্যে এক জুলমতের জামানা। সে জামানার ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা উপাত্ত নিয়ে উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন জাতির দরদি এই কথাশিল্পী। BABD

আশা করি শেকড়সন্ধানী ঔপন্যাসিক শফীউদ্দীন সরদারের ভক্ত অনুরক্ত পাঠকরা *আওয়ারা* উপন্যাসটি পড়ে ভিন্ন স্বাদের আমেজ পাবেন। আর ইতিহাস-অন্বেষী পাঠকের জন্যে এটি একটি অসাধারণ সংগ্রহ হিসেবেও বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে। আমরা সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করি।

তারিখ :
১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঈ.

সমর ইসলাম
নিউজরুম এডিটর
একুশে টেলিভিশন

BABD

www.boighar.com

"ওরে দিল ওয়ালে
ওরে ভুলে ভালে
আওয়ারা ... ...!"

গানটি খুব ভালো লেগেছিল।
গানটির সঙ্গে উপন্যাসের
কাহিনীর মিল থাকায় নাম
দিলাম *আওয়ারা*।

www.boighar.com

–শফীউদ্দীন সরদার

১

'রসূল নামের ফুল এনেছিরে–
আয়, গাঁথবি মালা কে?
ঐ মালা পরে রাখবি বেঁধে,
আল্লাহ তাআলাকে–
আয়, গাঁথবি মালা কে?'

www.boighar.com

সরোবরের শানবাঁধা ঘাটের উপর সটান শুয়ে আছেন শাহ সুলতান। লোকে বলে শাহ সুরতান মাহী সওয়ার। ডাক নাম সুরতান সাহেব। ছিটকে পড়ছে সুরতান সাহেবের রূপ। 'বলখের' রাজপুত্র শাহ সুলতান ওরফে সুরতান সাহেব জন্মগতভাবেই অপরিসীম সৌন্দর্যের অধিকারী। তার চিত্তহারী চেহারা চিত্ত বিকল করে সকল রূপসীরই। কিন্তু কোন রূপসীর রূপ চিত্ত বিকল করে না সুরতান সাহেবের। জন্মগতভাবে সে 'আওয়ারা'।

সরোবরের শানবাঁধা ঘাটে টান হয়ে শুয়ে আছেন সুরতান সাহেব। কোনদিকেই তাঁর খেয়াল নেই। সে একমনে গেয়ে যাচ্ছে– 'আয়, গাঁথবি মালা কে?'

স্থান চট্টগ্রাম। সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকন্যা সুরমা রানী ঘাটে এলেন কলসী ভরতে। কিন্তু ঘাটে নামতে গিয়েই চমকে গেলেন তিনি। গোটা ঘাট জুড়ে পড়ে আছেন দেবতুল্য এক মানুষ। অর্থাৎ সুরতান সাহেব ঘাটের শানে পা রাখার কোন ঠাঁই রাখেননি তিনি। সুরমা রানী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, মানুষ তো নয়, যেন আসমানের জ্বলন্ত সূর্যটাই ঘাটের শানে নেমে এসে দপ দপ করে জ্বলছে। মানুষ এতো দর্শনধারী হয়, সুরমা রানী তা কল্পনা করতে পারেননি। তিনি কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে এই অপরূপ অবলোকন করলেন। কিন্তু রূপ দেখার সময় তার অল্প। কলস ভরে জলদি জলদি ঘরে ফিরতে হবে তাঁকে। তাই শায়িত ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করে সুরমা রানী জোরে জোরে আওয়াজ দিলেন কয়েকবার। কিন্তু কোন ফল হলো না তাতে। শায়িত ব্যক্তিটি আপন মনে গেয়েই চললেন– 'আয়, গাঁথবি মালা কে?'

Boighar & BABD

বিরক্ত হলেন সুরমা রানী। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– এই যে ফুলওয়ালা। শুনতে পাচ্ছেন? আপনি গোটা ঘাট জুড়ে পড়ে থাকলে আমি ঘাটে নামবো কি করে?

এবার শুনতে পেলেন গায়ক। বললেন– ও, ঘাটে নামবেন? নামুন, নামুন। এই যে আমি আমার দুই পা গুটিয়ে নিচ্ছি, আপনি ঐ দিক দিয়ে ঘাটে নামুন।

সুরমা রানী তাই করলেন। সুরতান সাহেবের পায়ের পাশ দিয়ে সরোবরের পানিতে নামলেন। এরপর কলসীর মুখ ডুবিয়ে দিলেন পানিতে। কিন্তু সুরমা রানীর চোখ কলসীর মুখের দিকে রইলো না। তার চোখ নিবদ্ধ রইলো সুরতান সাহেবের অনবদ্য সুন্দর মুখের দিকে। যখন কলসী ভরে তলিয়ে যেতে লাগলো পানির মধ্যে, তখন হুঁশ ফিরল সুরমা রানীর। তিনি কলসী কাঁখে নিয়ে উঠে গেলেন ঘাট থেকে। উঠে যাওয়ার সময়ও যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ তাঁর চোখ রইলো সুরতান সাহেবের মুখের দিকে।

www.boighar.com

রাধা কৃষ্ণের কাহিনীতে আছে– ঘাটের উপর গাছের ডালে কৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠলেই ভরা কলসী ঢেলে ফেলে শ্রী রাধিকা ছুটে ঘাটে যেতো কলসী ভরতে। সুরমা রানীর ক্ষেত্রে কোন বাঁশি বেজে উঠতে হলো না। সুরতান সাহেবের রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণে সুরমা রানী ভরা কলসী ঢেলে ফেলে আবার ঘাটে এলেন কলসী ভরতে। সুরতান সাহেব পূর্ববৎ পড়ে ছিলেন শানের উপর। সুরমা রানী এবার মধুরকণ্ঠে বললেন– এই যে, শুনতে পাচ্ছেন?

অর্ধচৈতন্য অবস্থায় সুরতান সাহেব প্রশ্ন করলেন– কে?

সুরমা রানী বললেন– আমি আবার এসেছি কলসী ভরতে?

সুরতান সাহেব নির্লিপ্তকণ্ঠে বললেন– ও!

সুরমা রানী বললেন– আপনি সব সময় ঘাটে পড়ে থাকেন কেন?

সুরতান সাহেব বললেন– কোথায় যাবো?

: আপনার বাড়িঘর নেই?

: না।

: সেকি, থাকার কোন জায়গা নেই?

: না।

: খাবার জায়গা? মানে খাওয়া দাওয়ার স্থান?

: না, নেই।

: তাও নেই?

: না ।

: তাহলে খান কি?

: কেউ দিলে খাই, না দিলে না খাই ।

: না খেয়েই থাকেন?

: তাছাড়া উপায় কি?

: না খেয়ে কেউ বাঁচে?

: আমি জানি না ।

: না খেয়ে থাকলে মানুষ তো মরে যায় ।

: আমিও মরে যাবো । কেউ একান্তই কিছু না দিলে আমিও মরে যাবো ।

: এর আগে দুই একবার মরেছেন?

: না, সে অভিজ্ঞতা নেই ।

: সে অভিজ্ঞতা নেই?

: না । কেউ না কেউ কিছু না কিছু খাইয়েছে, তাই মরিনি ।

: এই ঘাটে এসে খাওয়ায়?

: মানে?

: সব সময় এই ঘাটেই পড়ে থাকেন?

: না । কখনো এখানে, কখনো সেখানে থাকি । রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কেউ না কেউ কিছু খাওয়ায় বলে মরি না । একান্তই কেউ কিছু না খাওয়ালে মরে তো যাবোই ।

: আজ কিছু খেয়েছেন?

: না, কয় দিন হলো কিছু খাইনি ।

: তাজ্জব! আপনি কোথা থেকে আমাদের এখানে এসেছেন?

সুরতান সাহেব ক্লান্তকণ্ঠে বললো– আমার মনেই নেই ।

সুরমা রানী নাখোশকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– মনেই নেই মানে? মনে নেই কি কথা?

কোন জবাব দিলেন না সুরতান সাহেব । সুরমা দেবী কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন– কি হলো? জবাব দিচ্ছেন না কেন?

Boighar & BABD

আর কোন জবাব দিলেন না সুরতান সাহেব। চোখবুঁজে কেবলই ধুঁকতে লাগলেন। সুরমা বানী আরো কয়েকবার প্রশ্ন করলেন। কিন্তু সুরতান সাহেব নীরব। তা দেখে হতাশ দিলে ফিরে গেলেন সুরমা রানী। পরের দিন আর এলেন না।

কিন্তু মন মানলো না। তার পরের দিন প্রত্যুষেই সুরমা রানী আবার ছুটে এলেন ঘাটে। কিন্তু এসে দেখলেন, সব শেষ। ফুলওয়ালার কণ্ঠে কোন গানও নেই, দেহের কোন নড়ন চড়নও নেই। একদম নীরব নিথর।

চমকে উঠলে সুরমা রানী। নাকে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস পরীক্ষা করলেন। কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বুঝতে পারলেন না। মরেই গেছে ভেবে কাতর হলেন সুরমা দেবী। হঠাৎ দেখলেন, একবার একটু মুখ হা করলো লাশ। তার জিহ্বা অল্প একটু নড়ে উঠলো। এরপর আবার সব নীরব হয়ে গেল।

সুরমা রানী বুঝলেন, লোকটার অন্তিম সময় উপস্থিত। অনাহারেই মরে যাচ্ছে লোকটা। বুঝতে পেরেই বাড়িতে ছুটে গেলেন সুরমা রানী। বাড়ির বিশ্বস্ত চাকর হরিদাস ও অন্যান্য চাকরদের হুকুম করলেন তার সাথে ছুটে আসতে। সুরমা রানীর হুকুম রাজ হুকুমেরও বাড়া। হুকুমের একটু ইংগিত পাওয়ার সাথে সাথে তার পেছনে ছুটে এলো বাড়ির চাকর-বাকর সকলেই। সুরমার পিতা-মাতাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চাকর-বাকরদের সাথে নিয়ে ঘাটে এসেই সুরমা রানী সুরতান সাহেবকে বাড়িতে তুলে আনার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুরতান সাহেবকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে এলো বাড়িতে।

এরপরে শুরু হলো শুশ্রূষা। দাসদাসী নিয়ে সুরমা রানী নিজেই সুরতান সাহেবের শুশ্রূষার লেগে গেলেন। অতি সতর্কতার সাথে আগে রোগীকে তরল পানীয় পান করালেন। পান করানোর সাথে সাথে নড়ে উঠলো রোগী। এরপর আস্তে আস্তে কিছু তরল খাদ্য খাওয়ালেন। আহার পেটে যাওয়ায় স্বস্তির সাথে ঘুমিয়ে গেল রোগী।

ঘুম ভাঙ্গার পরই সুরমার পিতা-মাতা রোগীর পরিচয় জানার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুরমা দেবী রাগত চোখে তাদের সরিয়ে দিলেন সেখান থেকে। দু'দিন দু'রাত পর নিজে নিজেই উঠে বসলেন রোগী সুরতান সাহেব। এবার সুরমা রানী নিজেই তাঁর পয়-পরিচয় নিতে শুরু করলেন। প্রশ্ন করলেন– তুমি, মানে আপনি কে?

জবাবে সুরতান সাহেব সরাসরি বললেন আমার মনে নেই।

সুরমা রানী বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– মনে নেই মানে? মনে করার চেষ্টা করুন।

: চেষ্টা?

: হ্যাঁ, চেষ্টা। অসুস্থ হওয়ার আগে এত প্রফুল্লচিত্তে গান গাইলেন আর এখন মনে নেই বললেই হবে? চেষ্টা করুন।

নীরব হলেন সুরতান সাহেব। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে ধীরকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

: সাব্বাস! কি নাম আপনার?

: নাম? নাম শাহ সুলতান।

: কি বললেন? শাহ সুলতান?

: জি, শাহ সুরতান। শাহ সুলতান আর এখন কেউ বলে না।

: কি বলে?

: সবাই বলে সুরতান সাহেব।

: তার মানে! আপনি মুসলমান?

: সাচ্চা মুসলমান। নিখাদ মুসলমান। আপনি?

সুরমা রানী স্বচ্ছকণ্ঠে বললেন– আমি হিন্দু।

চমকে উঠলেন সুরতান সাহেব। বললেন– হিন্দু?

সুরমা রানী বললেন– কুলিন হিন্দু। কুলিন ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার পিতা-মাতা কুলিন ব্রাহ্মণ।

চোখ কপালে উঠলো সুরতান সাহেবের। বললেন– সর্বনাশ!

: কি হলো?

: তাহলে তো এখানে স্থান হবে না আমার। আপনার পিতা-মাতা আমাকে এখানে থাকতে দেবেন না।

: না দিলে চলে যাবেন।

: কোথায় যাবো?

: আগে যেখানে ছিলেন। রাস্তাঘাটে।

: রাস্তাঘাটে?

: হ্যাঁ, রাস্তাঘাটই তো আপনি ভালবাসেন। না খেয়ে থাকলে লোকে আপনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়।

: না না, এত যত্ন করে নয়। একটা লোক মরে যাচ্ছে দেখে, খাওয়ায়। আপনার মতো এত যত্ন করে নয়।

: তাই?

: তারপরে আবার রাস্তায় নামিয়ে দেয়।

: এখান থেকে নামিয়ে দিলেও রাস্তাঘাটে গিয়েই থাকবেন?

: ওরে বাপরে! রাস্তাঘাটে মোটেই সুখ নেই। রাস্তাঘাটে মশার বড় উৎপাত। মশার কামড়ে আমার বড় কষ্ট হয়।

: তাহলে?

: এখানে মশা নেই। এখানকার মতো এত সুখও রাস্তাঘাটে নেই। আমি এখানে থাকবো।

: এখানেই থাকবেন?

: হ্যাঁ। আপনার কাছেই থাকবো। আপনি বড় হৃদয়বতী মেয়ে। আপনার অন্তরে অনেক মায়া। আমি আপনার কাছেই থাকবো।

: কিন্তু আমার বাবা-মা আপনাকে না রাখলে?

: আপনি ওঁদের সামলিয়ে নিবেন। আপনি চেষ্টা করলেই ওঁদের সামলিয়ে নিতে পারবেন।

: কি করে বুঝলেন?

: দেখলাম সবাই আপনার হুকুম মানে। আপনাকে খুব মান্য করে।

: সে না হয় দাসদাসীরা মান্য করে। আমার পিতা-মাতাও? তাঁরা আমাকে মান্য করেন নাকি?

: তাঁরা আপনাকে ভয় করেন। আমি আস্তে আস্তে সব বুঝে নিয়েছি। আপনি আমাকে রাখলে আর কেউ আমাকে তাড়াবেন না।

: আশ্চর্য! আমার কাছে আপনি থেকে কি করবেন?

: আপনার খেদমত, মানে সেবা করবো।

: আমার সেবা করবেন? কি সেবা করবেন?

: আপনার হাত-পা ধোয়ার পানি বয়ে দেবো। আপনার কাপড় জামা কেঁচে দেবো। আপনি সব সময় পাদুকা পায়ে রাখেন। আপনার সেই পাদুকা সাফ করে দেবো। এছাড়া সময় পেলেই আপনার পা টিপে দেবো।

এবার চমকে উঠলেন সুরমা দেবীও। বললেন– খবরদার! খবরদার!! ও কথা আর কখ্খনো বলবেন না। বললে আমার যার পর নেই পাপ হবে।

সুরতান সাহেব বললেন– তা হবে কেন? আপনি আমার আশ্রয়দাতা। আপনার পাপ হবে কেন?

: হবে না মানে? আপনি আমার বয়সে বড়। আমার গুরুজন। আমি আপনার পা টিপে দিলে আমার কোন পাপ হবে না। আপনিও পাপী হবেন না। বরং আমার তাতে অনেক পুণ্য হবে।

: পুণ্য হবে?

: আজ্ঞে, তাই হবে। দরকার হলে আমি আপনার পা মাথা টিপে দেবো। আপনি টিপবেন কেন?

: কিন্তু প্রয়োজনে বড়রাও ছেলে মেয়ের বা স্ত্রীর পা টিপে দেয়। তাতে তো দোষ নেই।

: কিন্তু আমি আপনার ছেলে মেয়েও নই, স্ত্রীও নই। দোষ হবে না কেন?

সুরতান সাহেব উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন– কি মায়া, কি মায়া! আপনাকেও ওসব করতে হবে না। আমাকে থাকতে দিলেই আমি খুশি। আপনি তাহলে আমাকে থাকতে দিচ্ছেন?

সুরমা রানী প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন– স্বাচ্ছন্দে থাকবেন।

সুরতান সাহেব ফের বিমুগ্ধকণ্ঠে বললেন– কি মহৎদিল। কিন্তু তাতে কেউ কিছু বলবে না তো?

: কেউ না, কেউ না।

: আপনার বাবা-মা?

: তাঁরাও কিছু বলবেন না। বরং তাঁরা আপনাকে খুবই স্নেহ করবেন।

: দাস-দাসী?

: তাদের যখন হুকুম করবেন, তারা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করবে।

: বলছেন?

: হ্যাঁ, বলছি। আমাদের দাস-দাসী মানে আপনারও দাস-দাসী। আপনার সেবা করতে পারলে তারা সবাই খুব খুশি হবে।

: সুরমা–

বলেই জিহ্বায় কামড় খেলেন সুরতান সাহেব। বললেন– তওবা! আপনার নাম বলে ফেললাম।

সুরমা রানী হাসিমুখে বললেন– বলবেন তো! আপনি বয়সে আমার বড়। আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন।

সুরতান সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন– কখ্খনো নয়। আপনি আমার আশ্রয়দাত্রী। আমাকে কেটে ফেললেও আমি আপনাকে সেরেফ সুরমা বলতে পারবো না। সুরমা রানীই বলবো।

সুরমা রানী হেসে বললেন– বেশ, তাই বলবেন। কিন্তু দাস-দাসীদের হুকুম করতে ইতস্তত করবেন না। তাতে তারা দুঃখ পাবে। যখন যা খুশি তাই করতে বললে, এমন কি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে এবং গালমন্দ দিলেও তারা মনে মনে খুশি হবে। ঠিক আছে?

সুরতান সাহেব হৃষ্টচিত্তে বললেন– তথাস্তু রানী সাহেব! সুরমা রানীও হেসে বললেন– বহুত আচ্ছা সুলতান সাহেব।

২

অর্ধমদ্রিত নয়নে সুরতান সাহেব বললেন– আরে এই যে বাবা হাড়ির চরণ–

বাড়ির বিশ্বস্ত চাকর হরিদাস চমকে উঠে বললো– আরে না না, হাড়ির নয়...!

সুরতান সাহেব বললেন– ও, ডোমের?

হরিদাস বললো– না না, ডোমের নয়।

: তবে কি মুচির?

: কি যে কন কত্তা! মুচির হবো কেন? আমি হরির চরণের দাস। মানে হরিদাস বাঁশিওয়ালা।

: ও, হাড়ির বাঁশ? মানে হাড়ির বাঁশ দাশীওয়ালা?

: আরে দূর দূর। আমি হরিদাস বাঁশিওয়ালা। সব সময় বাঁশি বাজাতে ভালবাসি কি না, তাই?

: বুঝেছি বুঝেছি। হাড়ির দাস বাঁশিওয়ালা।

হরিদাস বিরক্ত হয়ে বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাই।

সুরতান সাহেব খুশি হয়ে বললেন– সাব্বাস। তা বলছিলাম কি বাবা–

: আজ্ঞে বলুন?

: হাড়ির দাস আছো, থাকো। যুগ যুগ থাকো। শুধু আমাকে খাবার দেয়ার সময় নামটা একটু বদলাতে হবে বাবা।

: বদলাতে হবে?

: জি বাপধন। তখন হাড়ির দাসের বদলে একটু আবদুল্লাহ, মানে আল্লাহর দাস হতে হবে বাবা।

: রাম রাম! আমি হরির দাস। ঈশ্বরের দাস। আল্লাহর দাস হবো কেন?

: কথা তো ঐ একই। আল্লাহর দাস, ঈশ্বরের দাস, একই কথা।

: তা হোক– তা হোক। ঈশ্বর ছেড়ে আমি আল্লাহর দাস হবো না। নাম আমার হরিদাস। এটা আমার ভুলে গেলে চলবে?

Boighar & BABD

: শুধু ঐ সময়টুকুর জন্য বাবা। এরপরেই ফের হাড়ির দাস, মুচির দাস, যার ইচ্ছে তারই দাস হয়ে যেও। শুধু ঐ সময়টুকুর জন্য বাপধন।

একটু চিন্তা করে হরিদাস বললো– তার মানে? আপনি তাহলে মুসলমান?

: এতদিনও শুনোনি! চৌদ্দপুরুষ বাবা। তিন চৌদ্দং বিয়াল্লিশ পুরুষ আমি মুসলমান।

: তা একটু শুনেছি, বিশ্বাস করিনি। তাহলে এখানে আছেন কেন?

: কোথায় থাকবো? আমার তো থাকার জায়গা নেই।

: তাহলে ভাগাড়ে থাকবেন। এখানে কেন? এঁরা যে কুলিন হিন্দু। হিন্দুর বাড়িতে কেন?

: তা কুলিন হোক আর পতিতই হোক, এখানে মশা অনেক কম বাবা। মশার কামড় আমি সহ্য করতে পারিনে।

: তাই বলে মুসলমান হয়ে হিন্দুর বাড়িতে থাকবেন? এটা তো ঠিক নয়।

: তা আমি মুসলমান বলে এরা কেউ কিছু বলেন নাকি?

: কত্তা মশায় কিছু কিছু বলেন। কিন্তু দিদিমনি কত্তা মা– এঁরা কেউ কিছু বলেন না। এরা খুবই ভালবাসেন আপনাকে।

: হক মাওলা! তা কেন বাবা? এঁরা কেন ভালবাসেন আমাকে?

: টান কত্তা। টান– টান, নাড়ীর টান। বলতে পারেন শিকড়ের টান।

: কেমন কেমন?

: এঁদের কোন সন্তানাদি ছিল না। আপনাদের কোন এক পরিবারকে ধরেই এই সুরমা দিদি মনিকে পেয়েছেন।

: না বাপধন, কথাটা ভিড়লো না।

: ভিড়লো না মানে?

: মানে, খাপ খেলো না। কোন পীর বাবার সাধ্য নেই কাউকে কোন সন্তানাদি দান করেন। সে মালিক একমাত্র আল্লাহ।

: তাহলে ঐ আল্লাহকে ঐ পীর বাবা ধরেছেন। পীর-দরবেশের কেরামাত বোঝা কি এত সোজা! বন-জঙ্গলে কিংবা পাহাড়-পর্বতে বসে ঐ আল্লাহকে এমন ডাকাই ডেকেছেন যে, আল্লাহ আর তার হাত এড়াতে পারেন নি। হয়তো পীরকে বলেছেন, যা বেটা, গিয়ে দোয়া ফুঁক ঠুকে দে, হয়ে যাবে বাচ্চা।

: হতে পারে, এটা হতে পারে। কিন্তু–

Boighar & BABD

: কিন্তু কি কত্তা?

: তোমাদের এত কালী-মাতা শিব-বাবা থাকতে, তোমাদের কত্তা মা মুসলমান পীর ধরতে গেলেন কেন?

: ধরেছেন, ধরেছেন। ওসব শিব-কালীর মূর্তি সবখানে তো পড়ে থাকে। মা ঠাকুরুণ গিয়ে ঐ কালীমাতা শিব-বাবার হাত-পা দুই হাতে ধরেছেন, কিন্তু কাজ হয়নি। ঐ এক মুসলমান পীর বাবাকে ধরেই এই দিদিমনিকে পেয়েছেন। মানে কথা, পীর বাবাই দিক আর আল্লাহই দিক, এই দিদিমনিকে তাঁরাই এঁদেরকে দিয়েছেন।

: কিন্তু তাই বলে মুসলমানের দারস্থ হলেন কেন তাঁরা?

: কত্তা বাবুর তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কর্তা মা যে ছাড়েন না, তাঁর যে বাচ্চা একটা চাই-ই!

: সোবহান আল্লাহ!

: আজ্ঞে!

এই সময় অন্দর থেকে কর্তা মা ডাকতে শুরু করলেন– হরিদাস, হরিদাস ও হরিদাস! কোথায় গেলে বাপু–

০ ০ ০

সুরতান সাহেব বাড়ির বাইরে এক নির্জন কক্ষে থাকে। যতক্ষণ শুয়ে থাকে ততক্ষন সে কেবলই গুন গুন করে গায়– 'আয়, গাঁথবি মালা কে?'

ঘুম না ধরলে বা শুয়ে থাকতে ভাল না লাগলে, ঘরের বাইরে এসে ঘুরে বেড়ায় আর আঙ্গিনায় বিচরণকারী কুকুর বিড়াল তাড়ায়। রোদে মেলে দেয়া আঙ্গিনায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা শস্যদানা থাকলে আর কথা নেই। সে কাক-চিল পাখ-পাখালির পেছনে ঢিল ছুঁড়ে বেড়ায়।

তার স্বভাব বা আচরণ দেখে লোকজুটে যায় সেখানে। তারা হাসে আর ঠাট্টা করে বলে– আরে এই পাগলা গোঁসাই, এই পাগলা ভোলা, হঠাৎ পাখ-পাখালির উপর এমন ক্ষেপে গেলে কেন বাবা?

চিল কাক লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে সুরতান সাহেব বলেন– বেহুদা, ব্যাটারা একদম বেহুদা। রোদে মেলে দেয়া খাবারগুলো ছোঁ মেরে নেয়ার জন্যে ছুটে ছুটে আসছে। –বলেই ফের কাক-চিলদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে– ভাগ, ভাগ। পালা ব্যাটারা পালা...

Boighar & BABD

এদের একজন টিপ্পনী কেটে বলে– আরে এই গোঁসাই, তাতে তোমার কি? তুমি খাবারগুলোর পাহারাদার?

সুরতান সাহেব আক্ষেপ করে বলেন– দেয় না তো। আমাকে তো কাজটা দেয় না। দিলে আমি বাঁশ নিয়ে মাঝ আঙ্গিনায় বসে থাকতাম।

: বলো কি! এই রোদের মধ্যে! এই ঝাঁ ঝাঁ রোদের মধ্যে?

: কুচ পরোয়া নেই।

: মানে? গায়ের চামড়া তোমার মানুষের না গন্ডারের? তা দিলে গায়ে তোমার এই কাঠফাটা রোদের তাপ লাগতো না?

: সয়ে গেছে, সয়ে গেছে।

: কি রকম?

: আগে থাকার জায়গা ছিল না তো। রাস্তাঘাটেই পড়ে থাকতাম। তাই রোদ-বৃষ্টি আমার সয়ে গেছে।

অন্য একজন বলে– কোন ঘাটের মড়া তুমি বাবা? হঠাৎ এই কুলিন ব্রাহ্মণের ঘরে কেমন করে ঢুকলে?

www.boighar.com

সুরতান সাহেব সহাস্যে বলে– হাড়ির দাস জানে। বেটা হাড়ির দাস সব জানে।

: হাড়ির দাস! সে আবার কে?

: হরিদাস, হরিদাস! হাড়ির দাস বললেও সে রাগ করে না।

: রাগ করে না?

www.boighar.com

: না। হরিদাস খুব ভাল ছেলে। আমার সাথে তার বেজায় ভাব। সে বাঁশি বাজায়, আমি গান গাই– 'আয়, গাঁথবি মালা কে?'

বলতে বলতে সুরতান সাহেব আবার কাকের পেছনে ছোটে। সমবেত লোকেরা অবাক হয়। তাদের মধ্যে একজন মুরুব্বী লোক বিরক্তির সাথে বলে– আরে দূর দূর! দেখছো না, ওটা একটা বদ্ধ পাগল! পাগলের সাথে কথা বলাই এক ঝকমারী। কোন সুস্থ লোকের পাগলের সাথে কথা বলা উচিত নয়। চলে এসো, চলে এসো সবাই...

মুরুব্বির পেছনে যেতে যেতে অনেকেই বলে– তা ঠিক, তা ঠিক; তবে পাগলটার চেহারাটা কিন্তু মারাত্মক। একেবারে মনকাড়া চেহারা।

মুরুব্বী ফের বলে– তা হোক, তা হোক। মাকাল ফলের চেহারা মনকাড়া লাল টুকটুকে হয়।

Boighar & BABD
আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে সুরমা রানী এদের কথাবার্তা সব শুনে, আর হাসে। সমবেত লোকজন চলে যাওয়ার পর সুরমা রানী সুলতান সাহেবকে এক ধারে ডেকে নিলেন। এরপর সামনে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন– আপনি কে?

বুঝতে না পেরে সুরতান সাহেব বললেন– কে মানে?

সুরমা রানী বললেন– মানে ঠিক করে বলুন তো, কে আপনি?

: সে কি! আমি, আমি। সুরতান সাহেব। শাহ সুলতান।

: সে তো শুনেছি। আসলে বাড়ি কোথায় আপনার?

: বাড়ি? আমার আবার বাড়ি কি? আমার তো কোন বাড়ি নেই।

: বাড়ি নেই?

: না। এইটেই তো আমার বাড়ি। আপনার বাড়িই আমার বাড়ি।

: এখন আপনার বাড়ি। কিন্তু আগে কোথায় ছিল?

: কোথাও ছিল না।

: আমার বাড়িতে আপনি এলেন কোত্থেকে?

: ঘাট থেকে। আপনিই তো আমাকে এনেছেন।

: তা এনেছি। কিন্তু ঘাটে তো আপনি জন্মগ্রহণ করেননি। কোথাও না কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন। কোথাও অবশ্যই বাড়ি ছিল আপনার।

: ছিল?

: হ্যাঁ, ছিল। কোথায় সে বাড়ি?

: আমি জানি না।

সুরমা রানী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– জানি না মানে?

সুরতান সাহেব ঢোক গিলে বললেন– আমার মনে নেই।

সুরমা রানী চাপ দিয়ে বললেন– মনে করার চেষ্টা করুন। আমার এখানে আপনি এলেন কোত্থেকে?

সুরতান সাহেব আমতা আমতা করে বললেন– এলাম মানে...

সুরমা রানী ফের ধমক দিয়ে বললেন– হ্যাঁ। মনে করার চেষ্টা করুন। কোত্থেকে এলেন?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুরতান সাহেব বললেন– অনেক দূর থেকে।

: অনেক দূর থেকে?

: জি ।

: সে দূরটা কোথায়?

: আমার মনে নেই ।

: তাজ্জব! তাহলে সেখান থেকে এলেন কি করে?

: কি করে?

: হ্যাঁ, কি করে? উড়ে?

: না না, আমি উড়তে জানিনে ।

: তবে কি হেঁটে এসেছেন?

: হেঁটে? না না, অত দূর থেকে কি হেঁটে আসা যায়?

: তাহলে কি সাঁতরিয়ে এসেছেন?

সচকিত হয়ে উঠলেন সুরতান সাহেব । বললেন– সাঁতরিয়ে?

: হ্যাঁ । নদী কি সমুদ্দুর সাঁতরিয়ে এসেছেন?

উল্লসিতকণ্ঠে সুরতান সাহেব বললেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে । আমি মাছের পিঠে চড়ে এসেছি ।

আবার বিস্মিত হলেন সুরমা দেবী । বললেন– মাছের পিঠে ।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, মাছের পিঠে । মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছি । সে জন্যে আমাকে মাহি সওয়ার বলতো লোকে । মাহি আছোয়ার । বলিনি সে কথা?

: কই, না তো? সে কথা তো কখনো বলেননি!

: তাহলে ভুলে গেছি । আসলে আমি মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছি– শুধু এটুকুই মনে আছে । আর কিছু মনে নেই ।

সুরমা রানী হতাশকণ্ঠে বললেন– পাগল কাঁহাকার! মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছেন– এটা কি কোন কথার কথা?

: নয়?

: না । এটা পাগলের কথা । আস্ত পাগলের কথা ।

: আমি পাগল?

: একশোবার পাগল । সম্পূর্ণ আওয়ারা লোক আপনি ।

: কি করে বুঝলেন?

Boighar & BABD

: আপনার কথা শুনে। আপনার কথাবার্তা সবই আজগুবি! মাছের পিঠে চড়ে কেউ কখনো কোথাও যেতে পারেন! এর উপর বলছেন, আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। কিন্তু সে জায়গাটা কোথায়, মানে কোথা থেকে এসেছেন, তা বলতে পারছেন না। এসব কি কোন সুস্থ লোকের কথা?

: তাহলে?

: তাহলে আবার কি? আপনি আস্ত একটা পাগল। মস্তিষ্ক বিকৃত লোক– এটাই আসল কথা। আপনাকে নিয়ে আমাকে সত্যিই এবার ভাবতে হবে।

: কি ভাববেন?

: কাছে তো নয়ই, কোন পাগলকে বাড়িতেই রাখা যাবে কি না, সেটা ভাবতে হবে। কখন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবেন আপনি, কে জানে?

: দুর্ঘটনা? কি দুর্ঘটনা?

: কখন আপনি কার মাথায় বাড়ি দেবেন, কার ঘরে আগুন দেবেন, তা কি বলা যায়? মাথা যার ঠিক নেই, সে সব পারে।

: তাহলে? আমাকে আর বাড়িতে রাখবেন না?

: সেটা এখন ভেবে দেখতে হবে, আমি কি করবো। বাপ্‌রে! একটা বদ্ধ পাগলকে বাড়িতে রাখা কি কম বিপদের কথা?

সুরতান সাহেবের মুখমণ্ডল ছাইয়ের মতো পাংশু হয়ে গেল। তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন– ঠিক আছে, আমাকে তাড়িয়ে দিন। রাস্তার লোক আমি, রাস্তায় চলে যাই...

সুরমা রানী থতমত করে বললেন– এ্যাঁ! রাস্তায় চলে যাবেন?

: খামোখা আপনাদের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে লাভ কি? নিজের যার বাড়ি নেই, নিজের যার কেউ নেই, তার রাস্তায় যেতে আপত্তি করলে চলবে কেন?

সুরতান সাহেবের দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেল এবং টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা ঝরে পড়লো মাটিতে।

সুরমা রানী চমকে উঠে বললেন– আরে আরে! একি!

দুই হাতে চোখ মুছে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন সুরতান সাহেব এবং ধরা গলায় বললেন– আমার যা দোষ-ত্রুটি হয়েছে মাপ করে দেবেন। আমি যাই...

হুঁশে এলেন সুরমা রানী। হুঁশে এসে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– যাই মানে? কোথায়?

: রাস্তায়।

: অসম্ভব! যেতে চাইলেই কি আমি আপনাকে যেতে দেবো?

: দেবেন না?

: না। যেতে হলে আমাকে মাড়িয়ে যেতে হবে। আপনার সামনে আমি টান হয়ে শুয়ে পড়বো।

: সে কি!

: এখানে আপনার নিজের কেউ না থাকলেও আমি তো আছি। নাই বা হলেম নিজের, তবু আমাকে একেবারে পর ভাবছেন কেন?

: সুরমা!

: আমাকে ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবেন আপনি? আমার কথা একবারও মনে হবে না?

: কেন হবে না? আমার জন্যে কত করেছেন আপনি। আমার মুমূর্ষু অবস্থায় কত দরদ দিয়ে আমার সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। আমাকে না খাইয়ে নিজে আপনি খাননি। আমাকে ঘুমুতে না পাঠিয়ে নিজে আপনি ঘুমোননি। আমার সুখ-শান্তির দিকে সদা-সর্বদা প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন আপনি। এসব কি কখনো ভোলা আমার সম্ভব?

: সম্ভব যদি নয়, তাহলে এ খেয়াল ছাড়ুন। আপনি কোথাও যেতে পারবেন না। এ বাড়িতেই আর আমার কাছেই থাকবেন আপনি।

সুরতান সাহেব বিহ্বলকণ্ঠে বললেন– সুরমা!

সুরমা রানী করুণকণ্ঠে বললেন– তবু যদি যেতে চান, যাওয়ার আগে আমার মরা মুখ দেখবেন আপনি।

চোখের পানি চেপে এক ঝটকা মেরে সেখান থেকে উঠে গেলেন সুরমা রানী।

০ ০ ০

কয়েকদিন পরের ঘটনা। ঘটনা মানে, এক ভয়ংকর ঘটনা। বাড়ির পাশে সরোবরের ঘাটে যাচ্ছিলেন সুরমার মা। পথে বিশাল এক গোখরে সাপ ব্যাঙ ধরার লক্ষ্যে ঘাসের মধ্যে দিয়ে শুড় শুড় করে ঘাটের দিকে এগুচ্ছিলো। ভীষণ তাড়া ছিল সুরমার মায়ের। তাই কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুতপদে ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন আর দেখতে না পেয়ে সেই সাপের লেজ পা দিয়ে সজোরে ডলে দিয়ে গেলেন।

Boighar.BARD

আর যায় কোথায়? লেজে আঘাত লাগায় গোখরোটা বিশাল ফণা তুলে সঙ্গে সঙ্গে সগর্জনে তাড়া করলো সুরমার মাকে। দেখতে পেয়েই সুরমার মা আঁতকে উঠলেন আর কলসী ফেলে দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাপটা তাঁর পিছু ছাড়লো না। সেও ফণা তুলে সুরমার মায়ের দিকে ছুটে যেতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে সুরমার মার 'বাঁচাও বাঁচাও, কালসাপ আমাকে তাড়া করেছে! আমাকে সাপে খেলো... আমাকে বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

সুরমাদের একেবারে বাড়ির পাশে ঘটনা। চিৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সুরমা রানী, সুরমা রানীর বাপ ও হরিদাসসহ বাড়ির সকল দাসদাসী। ছুটে এলেন আশপাশের লোকজন। বেরিয়ে এসে ঘটনাটা দেখেই চমকে উঠেলেন সকলে এবং যে যা হাতের কাছে পেলেন তাই নিয়ে সেদিকে দৌড় দিলেন।

কিন্তু তাদের সেখানে পৌঁছার অপেক্ষা রইলো না। সুরমার মা খানিকটা কাপড়ের প্যাঁচ বেঁধে আর ভীষণ আতংকে শাটপাট পড়ে গেলেন মাটিতে। সাপটা তার পেছনেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ছোবল মারার জন্যে ফণা তুললো। শ্বাসরুদ্ধ করে সকলেই দেখলেন আর রক্ষে নেই। এখনই ঐ বিশাল গোখরোটা দংশন করবে সুরমার মাকে। ঐ কালসাপে দংশন করলে আর বাঁচা নেই। সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন মহিলাটা।

কিন্তু যেমনি তাজ্জব তেমনি এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সবাই লক্ষ্য করলেন, কোথা থেকে যেন সেই মুহূর্তেই ছুটে এল সুরতান সাহেব। আর দংশন করার আগেই একটা বাঁশ দিয়ে সজোরে বাড়ি মারলেন সাপটার পিঠে। মাজা ভেঙ্গে গেল সাপটার। আহত হয়ে সাপটা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। আরও বেপরোয়াভাবে সুরমার মাকে দংশন করতে উদ্যত হলো।

চমকে উঠলো সুরতান সাহেব। সে দেখল, আরও পাঁচটা বাড়ি মারলেও সাপটা দংশন করবে সুরমার মাকে। তাই সে তৎক্ষণাৎ সাপটার লেজ ধরে সবলে এবং হেঁচকা এক টান মেরে সাপটাকে সরিয়ে আনলো অনেকখানি দূরে। ফের ফুঁসে উঠতেই সুরতান সাহেব বাঁশ দিয়ে তখনই সাপের পিঠে দুরন্ত ঘা মারলো একের পর এক। মরো মরো হয়ে সাপটা টান হয়ে গেল। এরপর বাঁশ দিয়ে সাপের মাথাটা থেঁতলিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। ফলে, সাঙ্গো হলো সাপটার ভবলীলা।

এতক্ষণ সকলেই দম বন্ধ করে এ দৃশ্য দেখছিলেন। সাপটা মারা যাওয়ার সাথে সাথে সবাই এক সঙ্গে 'সাব্বাস সাব্বাস' রবে দুরন্ত আওয়াজ দিয়ে উঠলেন।

এরপর সকলেই ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে। শুরু হলো সুরতান সাহেবের এন্তার প্রশংসা। অনেকেই বিহবলকণ্ঠে বলে উঠলেন– মানুষ নয়, মানুষ নয়। ঐ পাগলা গোঁসাই আসলেই মানুষ নয়। স্বয়ং ভগবান ওর রূপ ধরে এসে কত্তা মাকে বাঁচালেন। বাপরে বাপ! কি দুর্দান্ত সাহস! কি অপূর্ব আত্মত্যাগ। নিজের প্রাণ উপেক্ষা করে পরের প্রাণ বাঁচানোর এমন নজীর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাপটা ছোবল মারলে ঐ গোঁসাইও তো মরতে পারতো।

অন্যরা বললেন– পারতো মানে? নির্ঘাৎ মরে যেতো। একেই বলে পরোপকার। নিঃস্বার্থ পরোপকার!

সেই সাথে অনেকেই বললেন– এমন একজন মহৎপ্রাণ যুবককে পাগল ছাগল বলে কতই না তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি আমরা। কি ভ্রান্তি, কি ভ্রান্তি!

একজন প্রবীণ ব্যক্তি সশব্দে বললেন– ছাইয়ের মধ্যেই আগুন থাকে ছাইয়ের মধ্যেই আগুন থাকে। দেখুন, সবাই দেখুন, ছাই ভস্মের মতো রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষের মধ্যে থেকে কি আগুন বেরিয়ে এলো, দেখুন। সাব্বাস বেটা সাব্বাস!

নানা জন নানা কথা বলতে লাগলেন। সুরমার মায়ের এতক্ষণে সংবিত ফিরে এলো। সংবিতে এসেই তিন সুরতান সাহেবকে ছোট ছেলের মতো দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে বসালেন এবং বিহ্বলকণ্ঠে বললেন– বেটা, আমার বেটা, এটা আমার আপন বেটা।

সকলের শেষে মুখ খুললেন সুরমা রানী। বাড়িতে এনে সুরমা রানী সুরতান সাহেবকে নিয়ে নির্জনে বসলেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে অতীত আচরণের জন্যে অনুতাপের তুফান ছুটিয়ে দিলেন। সুরতান সাহেবের দুই হাত সবলে ধরে সুরমা রানী আবেগ আপ্লুতকণ্ঠে বলতে লাগলেন– আমাকে ক্ষমা করে দিন সুরতান সাহেব, আমাকে ক্ষমা করে দিন। না বুঝে আপনাকে 'পাগল, মস্তিষ্ক বিকৃত লোক, যখন তখন যে কোন অঘটন ঘটাতে পারেন আপনি' বলে কতই না হেনস্থা করেছি। একজন দেবতুল্য মানুষকে আমি হাড়ি ডোম ও চণ্ডালের অধিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছি। 'জ্ঞানবুদ্ধিহীন মাতালের অধিক ক্ষতি সাধন করতে পারেন আপনি', বলে আপনাকে কতই না অপবাদ দিয়েছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন!

সুরতান সাহেব বড়ই বিপাকে পড়ে গেলেন। 'আরে করেন কি, করেন কি' বলে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। 'আপনি কোন অপরাধ করেননি, ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না' বলে তিনি সুরমার আবেদন উড়িয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু তার আপত্তি কোন কাজেই এলো না। সুরমা রানী বার বার

Boighar & BABD
ক্ষমা চাইতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন– 'আমি অমার্জনীয় অপরাধ করেছি, আপনি ক্ষমা না করলে আমাকে নিকৃষ্ট নরকে পচে মরতে হবে।'

সুরমাকে শান্ত করতে সুরতান সাহেবের অনেক সময় লাগলো। শান্ত হওয়ার পর সুরমা রানী গদ গদ কণ্ঠে বললেন– কি যে উপকার করলেন আপনি, আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আপনাকে আমি বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছিলাম। অথচ আপনি না থাকলে আমার মাকে আমি আজ জীবিত পেতাম না। আপনার জন্যেই আজ বেঁচে গেলেন আমার মা।

www.boighar.com
সুরতান সাহেব বাধা দিয়ে বললেন– না না, বাঁচানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা সুরমা। আমি সেরেফ একটা উপলক্ষ্য।

: তা যাই হোন, বিদায় করাতো দূরের কথা, আপনার পায়ে, দৈনিক দুই বেলা ফুল না দিয়ে আমি অন্ন গ্রহণ করবো না।

সুরতান সাহেব লজ্জিতকণ্ঠে বললেন– ছিঃ ছিঃ! বলতে নেই, ও কথা বলতে নেই। আমার জন্যে ওটা চরম গুনাহর কথা।

সুরমা রানী বললেন– হোক, তবু আপনি আমার দেবতা।

: তওবা! এমন বললে আমি এখান থেকে চলে যাবো।

চমকে উঠে সুরমা রানী বললেন– ওরে বাপরে! আর আপনাকে যেতে দেই? দরকার হলে এমনি করে দুই বাহুতে বেঁধে রাখবো আপনাকে! –বলেই সুরমা রানী সুরতান সাহেবকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

চমকে উঠে সুরতান সাহেব দৌড় দিলেন সেখান থেকে। যেতে যেতে হাঁকতে লাগলেন– হরিদাস, হরিদাস, হরিদাস! তোমার দিদিমনি ক্ষেপে গেছেন। ভীষণ ক্ষেপে গেছেন! তোমার দিদিমনিকে সামলাও, শিগ্‌গির সামলাও...

০ ০ ০

চলে যেতে চাইলেও সুরতান সাহেব এখান থেকে চলে যেতে পারেননি। শুধু সুরমা রানীই নয়, বাড়ির কেউই তাঁকে যেতে দেননি। সুরতান সাহেব এখানেই রয়ে গেলেন।

কয়েক মাস পরের কথা। বছরটা প্রথম থেকেই খুব রুক্ষ আর কড়া হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথম থেকেই সূর্যের প্রখর তাপ শুরু হয়েছিল। কিছু দিন যেতে না যেতেই আকাশ থেকে আগুন ঢেলে পড়তে লাগলো। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা, অর্থাৎ মেঘের কোন নামগন্ধও আকাশে দেখা গেল না। চারদিক কেবলই খাঁ খাঁ

Boighar & BABD
করতে লাগলো। চৈত্র মাস পার হয়ে বৈশাখ মাস এবং বৈশাখ মাস শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে গেল, তবু এক ফোঁটা বৃষ্টি জমিনে পড়লো না। গাছের পাতা এবং মাঠের ঘাস-খড় শুকিয়ে খনখনে হয়ে গেল। দুমড়ে মুষড়ে গেল। তবু এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত নেই। রাতের কিঞ্চিৎ শিশিরপাতও বন্ধ হয়ে গেল। চারদিক কেবলই আগুনের মতো জ্বলতে লাগলো।

ডোবা-নালা তো দূরের কথা, সরোবরের পানিও শুকিয়ে একেবারে তলায় নেমে এলো। পানির অভাবে মানুষ দিশেহারা হয়ে গেল। সরোবরের একদম তলা থেকে ঘটি বালতিতে করে কিছু পানি আনা ছাড়া আর কোথাও পানি পাওয়ার কোন জায়গা রইলো না। সমুদ্রে অবশ্য অঢেল পানি ছিল। কিন্তু সে পানি যেমনি লবণাক্ত, সুরমাদের পাড়া থেকে তেমনি দূরে।

সুরমাদের পাড়ার প্রায় সকল ঘরই উলুখড়ের। সুরমাদের মতো আর দু'একজনের দুই একখানা টিনের ঘর থাকলেও আর সব এবং সকলের ঘরই খড়ের। খড়তাপে চালের খড়গুলো তেতে ঝনঝনে হয়ে গেল। সূর্যের তাপেই খড়গুলো জ্বলে উঠবে, এমনই অবস্থা হলো।

এই সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। সুরমাদের বাড়ির পাশের বাড়িটা এক খেটে খাওয়া গরীব বামুনের। এই দুর্দিনে বাইরে কাজ নেই, ঘরের চাউল প্রায় শেষ। বামুন ঠাকুরের বড়ই মুসিবত। চাউল কেনার পয়সা কোথায় পান, এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। বামুন ঠাকুরের বাড়িতে অবশ্য এক বিরাট উঁচু তাল গাছ ছিল। গাছে কচি তালও ছিল অনেক। তিনি চিন্তা করলেন, গাছের ঐ তালের বাদা কেটে বাজারে নিয়ে গিয়ে তাল শাঁস হিসাবে বিক্রি করলে কিছু পয়সা পাওয়া যাবে।

এই চিন্তা করেই তিনি হেঁসে-দড়ি নিয়ে তাল গাছে উঠে পড়লেন। খেটে খাওয়া মানুষ, বামুন ঠাকুর হলেও গাছে উঠতে তার অসুবিধা হলো না। কিন্তু গাছে চড়ে তালের বাদায় কোপ দিতেই বামুন ঠাকুরের দৃষ্টি অন্য দিকে আটকে গেল। তিনি দেখলেন, তাঁর রান্না ঘরের চুলোর নিভিয়ে দেয়া আগুন আবার জ্বলে উঠেছে। বামুন ঠাকুরের রান্না ঘরটা বাড়ির একপাশে ফাঁকে আর চুলোটা ঘরের চালের নীচে। রান্না বান্না সেরে বামুন ঠাকুরের স্ত্রী বাড়ির ভেতরে চলে গেছেন এবং শয়ন ঘরে কাজ করছেন। চুলোর আগুন নিভিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় চুলোর মধ্যকার একটা জ্বলন্ত চিকন বাঁশ তুলে বাঁশের আগুন অসাবধানতাবশত যেমন তেমন করে নিভিয়ে চুলোর মুখেই রেখে গেছেন।

খরতাপে আর বাতাসে অল্পক্ষণ পরই আবার জ্বলে উঠেছে সেই বাঁশের আগুন। তাল গাছের মাথায় থেকে বামুন ঠাকুর দেখলেন, তার রান্না ঘরের চালের নীচে

Boighar & BABD

চুলোর মুখে একটা বাঁশের আগায় আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। চমকে উঠলেন বামুন ঠাকুর। ঐ আগুন যদি কোনক্রমে ঘরের চাল স্পর্শ করে তো আর রক্ষে নেই। তার বাড়িই শুধু নয়, গোটা পাড়াটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সকলের চালের খড়ই ঝন ঝন করছে রোদে আর হালকা বাতাসে উড়ে উড়ে উঠছে। আগুনের স্পর্শ পাওয়া মাত্র বারুদের ঘরে আগুন লাগার মতো প্রমত্তবেগে জ্বলে উঠবে ঘরের চাল।

কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এই সময় পাড়ার বদ্ধ পাগল গয়ানাথ এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আগুন দেখে সে ছুটে এলো চুলোর কাছে এবং আগুনওয়ালা চিকন বাঁশটি হাতে তুলে নিয়ে হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগলো আর নাচতে লাগলো।

দেখেই চমকে উঠলেন বামুন ঠাকুর। তাল গাছের মাথা থেকে তিনি চিৎকার করে বললেন– আরে এই গয়া, এই গয়ানাথ, আগুন ফেলে দেরে! আগুন ফেলে দে। ঘরের চালে লাগলে ঘর দুয়ার পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

'পাগল তুই নাও ডুবাসনে' বলে পাগলকে নাও ডুবানোর কথা খেয়াল করিয়ে দেয়ার মতো অবস্থা হলো এখানেও। 'ঘরের চালে আগুন লাগলে ঘর দুয়ার পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে'– একথা কানে যাওয়া মাত্র পাগল গয়ানাথ ঘরের চালের দিকে তাকাতে লাগলো আর হিঃ হিঃ করে হাসতে হাসতে আগুন নিয়ে চালের কাছে যেতে লাগলো। বামুন ঠাকুর ফের চিৎকার করে বলতে লাগলেন– আরে এই গয়া, করিস কি, করিস কি?

কে শুনে কার কথা! গয়া এবার সত্যি সত্যি ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো। দম বন্ধ হয়ে গেল বামুন ঠাকুরের। এক লাফে ঐ উঁচু তাল গাছ থেকে নেমে এসে তিনি যে গয়াকে আটবেন, সেটা সম্ভব নয়। তাই তিনি অসহায়ের মতো বুঝলেন– এখনই জ্বলে উঠবে তার ঘর। যে প্রচণ্ড আগুন জ্বলে উঠবে তা দু'এক লোটা বা দু'এক বালতি পানি দিয়ে নেবানো অসম্ভব। দু'একজন মানুষের কাজও নয় সেটা। মানুষ লাগবে বিশ ত্রিশজন। অনর্গল ঢালতে হবে বালতি বালতি পানি। এত মানুষই বা কোথায় আর অনর্গল বালতি বালতি ঢালার মতো এত পানিই বা কোথায়? ঐ শুকিয়ে যাওয়া সরোবর থেকে দুই এক বালতি পানি আনতে আনতেই তাঁর আর অন্যদের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাল গাছের মাথা থেকে তিনি কেবলই তারস্বরে হাঁকতে লাগলেন– বাড়িঘর সব পুড়ে গেল। ওকে সামলাও, ওকে সামলাও...

চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লোকজন এবং কোথায় কি হলো তা দেখার জন্যে কেবলই এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। এ সময় অবিশ্বাস্য আর

Boighar & BABD
একেবারেই অকল্পনীয় ঘটনা। সুরতান সাহেব কোথা থেকে ছুটে এসে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন গয়ানাথের উপর এবং আগুনটা ঘরের চালে ঠেকা ঠেকা হতেই আগুন সমেত গয়ানাথকে শুইয়ে দিলেন মাটিতে। বেঁচে গেল ঘর। গয়ানাথের হাতের আগুন গয়ানাথের সাথে মাটিতে পড়ে গেল আর জ্বলতে লাগলো মাটিতে।

বামুন ঠাকুরের চিৎকারে আর গয়ানাথের পতনের শব্দে সকলের নজর এবার এদিকে ফিরলো। বামুন ঠাকুরানী সবার আগে চুলোর পাশে ছুটে এসে বলতে লাগলেন– কি ব্যাপার, কি ব্যাপার?

ইতোমধ্যে বামুন ঠাকুর নেমে এলেন গাছ থেকে এবং 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলতে বলতে চুলার কাছে এলেন। এরপর গিন্নীকে উদ্দেশ্য করে বললেন– কি ব্যাপার! আর একটু হলেই টের পেতে কী ব্যাপার! সুরমাদের বাড়ির এই স্বয়ং জগদ্বীশ্বর, এই সাক্ষাৎ ভোলানাথ এসে রক্ষে করলেন সবাইকে আর নির্ঘাত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন পাড়াটা। 'জয় প্রভু, জয় প্রভু' বলে সুরতান সাহেবকে লক্ষ্য করে দু'হাত বার বার কপালে ঠেকাতে লাগলেন।

এরপর তিনি সদ্য আগুন নিভে যাওয়া বাঁশের তপ্ত আগাটা তুলে গয়ানাথের পিঠে ঠেশে ধরলেন। গয়ানাথ আর্তনাদ করে উঠে 'ওরে বাপরে! মরেছি মরেছি' বলে পড়ি মরি দৌড় দিয়ে পালালো।

এবার সকলের প্রশ্নের জবাবে বামুন ঠাকুর ঘটনাটা আগাগোড়া সবাইকে বর্ণনা করে শুনালেন। সবশেষে সবাইকে বললেন– প্রণাম করুন, আমি যেভাবে প্রণাম করলাম, আপনারাও সবাই ঐভাবে হাত তুলে এই সাক্ষাৎ দেবতাকে প্রণাম করুন।

ঘটনাটা শুনে সবাই উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। সকলেই একবাক্যে বললেন– অবশ্যই, অবশ্যই প্রণাম করবো। 'জয় প্রভু, জয় প্রভু' বলে সকলে সুরতান সাহেবকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে প্রণাম করলেন। সেই সাথে কয়েক জন বললেন– শুধুই এই প্রণাম নয়, প্রভুকে কাঁধে নিয়ে আমরা সবাই শোভাযাত্রা করবো আর সারা পাড়া ঘুরবো।

অন্য একজন বললেন– শুধু শুধু নয়, বাদ্যি-বাজনা সহকারে শোভাযাত্রা করবো। আরে এই দীনবন্ধু, এই রমণী– যা শিগ্‌গির তোদের ঢোল কাঁশিগুলো নিয়ে আয়...

সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধু আর রমণী এক দৌড়ে বাড়িতে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সুরতান সাহেব কিছু বুঝে উঠার আগেই ঢোল-কাঁশি পিটাতে পিটাতে তারা

ঘটনাস্থলে ফিরে আসতে লাগলো। ঢোল-কাঁশির শব্দ কানে যেতেই উপস্থিত জনতা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো এবং সুরতান সাহেবের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

সুরতান সাহেব দেখলেন, এতগুলো লোক এসে এক সাথে ঘিরে ধরলে আর তিনি পালাবার পথ পাবেন না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি ঘটনাস্থল থেকে দৌড় দিলেন এবং এক দৌড়ে সুরমাদের বাড়িতে চলে এলেন।

সুরমা রানীও ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। সুরতান সাহেবকে দৌড় দিতে দেখে তিনিও দৌড় দিলেন আর দৌড় দিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। এসেই তিনি সুরতান সাহেবকে টেনে এনে তাদের সন্ধ্যা প্রদীপ দেয়ার তুলসী মঞ্চের নীচে বসালেন। বললেন– শোভাযাত্রা থেকে পালালেও পুষ্পাঞ্জলি নেয়া থেকে পালাতে আপনাকে দিচ্ছে কে? আমি আজ আপনার পায়ে পুষ্পঞ্জলি দেবো। এতদিন ইটের তৈরি নিষ্প্রাণ তুলসী মঞ্চে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি। আজ জীবন্ত দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবো আর শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে দেবতার পূজা করবো। এতগুলো মহা মহা উপকারের বিনিময়ে আমরা কি দেবতার মনোরঞ্জনে কিছুই করবো না? –বলেই সে হরিদাসকে ডেকে বলল– হরিদাস, আমার ফুল গাছগুলো থেকে শিগ্‌গির কিছু ফুল তুলে আনো তো...

জবাবে হরিদাস বললো– আনছি দিদিমনি, এই এখনই আনছি।

হরিদাস ফুল তুলতে গেল। সুরমা রানী সুরতান সাহেবকে সবলে ধরে রাখলেন।

সুরতান সাহেব আবার মুসিবতে পড়ে গেলেন। কি করবেন ভাবতেই, ফুল নিয়ে ফিরে এলো হরিদাস। সে মুহূর্তেই বামুন ঠাকুরের বাড়ির জনতার এক অংশ ঢোল-কাঁশি বাজাতে বাজাতে সেখানে এসে হাজির হলো। তারা একবাক্যে বললেন– দিন মামনি, শোভাযাত্রা পণ্ড হলো হোক! মহাপ্রভুর পূজোটা ধুমধামে দিন। আমরা মহাপ্রভুকে ঘিরে নিয়ে ঢোল-কাঁশি বাজিয়ে আপনাকে সাহায্য করছি ...

জনতা অগ্রসর হতে লাগলো। সুরতান সাহেব দেখলেন আর বিলম্ব করার সময় নেই। সমস্ত লোক এসে এক সঙ্গে চেপে ধরলে আমাকে আজ এই তুলসীতলায় পূজা গ্রহণ করতেই হবে। আমার ঈমান আকিদা সব মিসমার হয়ে যাবে, আমাকে জাহান্নামী হতে হবে।

www.boighar.com

এই চিন্তা করেই সুরমার হাত সবলে এড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুরতান সাহেব এবং কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই তিনি এক দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেউ আর তাঁকে খুঁজে পেল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সুলতান সাহেবকে কোথাও না পেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শাট হয়ে পড়ে গেলেন সুরমা রানী। আপ্লুতকণ্ঠে বলতে লাগলেন– আমার ভুল হয়েছে সুরতান সাহেব! আমার মহাভুল হয়ে গেছে। আপনি দয়া করে ফিরে আসুন, আমার মাথার দিব্যি, আপনি দয়া করে ফিরে আসুন। আর আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কিছুই করবো না। আপনি যা বলবেন আমি তা-ই মেনে চলবো। দোয়া কালাম পড়তে বললেও আমি তাই পড়বো, তবু আপনি ফিরে আসুন। আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আপনি দয়া করে ফিরে আসুন, ফিরে আসুন।

সুরমা রানী দাপাদাপি করতে লাগলেন।

৩

ভ্রমণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভর্তি তাঁর মস্তবড় থলেটা একপাশে রেখে হাজী খলিল পীর সাহেব ইতস্তত ঘুরাফেরা করছিলেন। তাঁর সামনেই চট্টগ্রামের জাহাজ ঘাট। ঘাটে একটি জাহাজ ভেড়ানো। জাহাজে ব্যবসায়ের মাল ভর্তি হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে মাল যাচ্ছে আরবে। সেখান থেকে আবার আরবের মাল আসবে চট্টগ্রামে। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ সচল আছে অনেক দিন থেকেই।

জাহাজের মালিক শেখ আবদুল আজিজ সাহেব জাহাজ থেকে নেমে কি এক কারণে বাজারের দিকে এসেছিলেন। বাজার থেকে ফিরে যাওয়ার পথে হাজী খলিল পীর সাহেবের সাথে হঠাৎ তার দেখা। খলিল পীর এই শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আর প্রিয় ব্যক্তি। পীর সাহেবকে দেখেই শেখ সাহেব উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন। আবেগ ভরে বললেন– আরে আরে, পীর সাহেব যে! কি খোশ নসীব! আজ আমার কি খোশ নসীব! কতদিন থেকে পীর সাহেবের দেখা নেই! কতদিন থেকে পীর সাহেবের সান্নিধ্য পাইনি। তা এখানে কি করছেন পীর সাহেব? কোনো জরুরী কাজে খুবই ব্যস্ত আছেন কি?

পীর সাহেব বললেন– আরে না না। কোন কাজই আমার এখন নেই। শুধু শুধুই আমার দিন কাটছে এখন। মন একদম ফাঁকা হয়ে আছে। বলা যায়, সে কারণে বড়ই অস্বস্তিতে আছি।

শেখ সাহেব আবার লাফিয়ে উঠে উল্লাসে বললেন– মার কাটারি। তাহলে আসুন, আমার সাথে আসুন।

পীর সাহেব বললেন– কোথায়?

শেখ সাহেব বললেন– আমার জাহাজে। ঐ তো সামনে ঘাটে আমার জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে। ঐ জাহাজে আসুন।

: জাহাজে! জাহাজে গিয়ে কি করবো?

: কি করবেন মানে? দেশে যাবেন। কতদিন হলো আপনি দেশ ছাড়া, দেশে যাবেন না?

: না শেখ সাহেব। এখানে আমার কাজ আছে। যদিও বর্তমানে কোন কাজ হাতে নেই, তবু এখানেই থাকতে হবে আমাকে। মস্তবড় প্রয়োজন আছে এখানে আমার।

শেখ আবদুল আজিজ সাহেব নাছোড়বান্দা। বললেন– প্রয়োজন আছে তো কি হয়েছে! বর্তমানে কিছুই যখন করছেন না, দেশ থেকে এক পাক ঘুরে আসতেও তো পারেন। মাত্তর ছয় মাসের ব্যাপার! পরে এসে সে প্রয়োজন মেটাবেন!

একটু চিন্তা করলেন পীর সাহেব। পরে খোশকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হতে পারে, তা হতে পারে। খামোখা বসে বসে সময় কাটছে না আমার। বড়ই অশান্তিতে আছি। আপনার সাথে গেলে আমার সময়টা অবশ্য বেশ আনন্দেই কাটবে।

: মারহাবা, মারহাবা। চলুন, চলুন। সাথে মালপত্র কিছু আছে কি?

: সামান্য। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো আমার ঐ থলেতেই আছে।

: বহুৎ খুব, বহুৎ খুব...। বলেই শেখ আব্দুল আজিজ সাহেব দৌড়ে গিয়ে পীর সাহেবের ঐ থলেটা কাঁধে তুলে নিলেন এবং বললেন– আসুন আসুন, আর উল্টাপাল্টা ভাববেন না।

: কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে না তো? মানে আমার থাকা শোয়া নিয়ে...

আর এক দফা খুশিতে দুলে উঠলেন শেখ আবদুল আজিজ সাহেব। বললেন– সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! অসুবিধে কি বলছেন? সৌভাগ্যক্রমে আমার জাহাজের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানে ভাল ও প্রশস্ত কামরাটা এখনও ফাঁকা আছে। কাউকে এখনও ওটা দেইনি। কি খোশ নসীব! আপনি আসবেন বলেই বোধ হয় ওটা কাউকে দেইনি। দিলের নির্দেশ, বুঝলেন, দিলের নির্দেশ! আসুন আসুন...

পীর সাহেবকে এনে শেখ সাহেব যে কামরায় তুললেন, সে কামরাটা সত্যি সত্যিই একটা মনোরম ও আকর্ষণীয় কামরা। যেমনি প্রশস্ত, তেমনি আসবাবপত্রে সুসজ্জিত কামরা। দু'তিন জনের আরামে শোয়া বসার মতো দু'তিনটে পৃথক আসন। এছাড়া কামরাটা খোলামেলা। আলো বাতাসে ভরপুর। সেই সাথে সমুদ্রের পুরো দৃশ্য দেখা যায়– এমন জায়গায় কামরাটা অবস্থিত। এই কামরায় উঠে পীর সাহেবের মন আনন্দে ভরে গেল।

পরবর্তী দু'দিনের মধ্যেই জাহাজে মাল তোলা সারা হলো। এখন জাহাজ ছেড়ে দেয়ার পালা। কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দেয়ার সময় এক উটকো ঝামেলা সৃষ্টি হলো। সুরমা রানীদের বাড়ির পাশেই বাস করে এক তরুণ। নাম গুরুদাস। সে

Boighar & BABD
সুরমাদের বাড়ির চাকর হরিদাসের সমবয়সী। উভয়ে উভয়ের বন্ধুও। তবে গুরুদাস কিছুটা লেখাপড়া জানে। হরিদাসের মতো একেবারে অশিক্ষিত নয়।

এই গুরুদাসের সমুদ্র দেখার বড়ই শখ। সমুদ্রের দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ কাহিনী সে শুনেছে। দূর থেকে একটু একটু দেখেছেও সমুদ্র। কিন্তু ভাল করে দেখেনি। তাই ভাল করে দেখার জন্যে সেদিন সে ছুটে এলো চট্টগ্রামের সমুদ্র বিধৌত এলাকায়। চলে এলো চট্টগ্রামের জাহাজ ঘাটে। ডাঙ্গা থেকে সে অনেকক্ষণ সমুদ্র দেখলো। আরো ভাল করে দেখার জন্যে ঘাটে ভেড়ানো জাহাজটায় উঠে পড়লো সে। খালাসী চাকর মজদুর অনেক লোক জাহাজে উঠানামা করছিল সে সময়। তাদের দলে মিশে সে উঠে পড়লো জাহাজে। কারো নজরে সে পড়লো না। www.boighar.com

জাহাজে উঠে সমুদ্র দেখতে দেখতে জাহাজের কিনার বেয়ে সে একদম চলে এলো জাহাজের অগ্রভাগে– যাকে বলে আগা গলুই। অগ্রভাগে এসে সে বিভোর হয়ে দেখতে লাগলো সমুদ্রের দৃশ্য। চারদিকে শুধুই পানি আর পানি। যতদূর নজর যায় তত দূরের মধ্যে কোন গাছপালা বা লোক বসতির চিহ্ন নেই। শুধুই সমুদ্রের গর্জন। পাহাড়ের মতো বিশাল উঁচু হয়ে উঠছে সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউগুলি আবার ভেঙ্গে পড়ছে সশব্দে। প্রচুর ফেনা সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। আবার তা মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষেই। www.boighar.com

গুরুদাস তন্ময় হয়ে এসব দৃশ্য দেখছে। কতক্ষণ ধরে সে দেখছে তা তার খেয়াল নেই। জাহাজটা যে নড়ে উঠলো তাও তার খেয়ালে এলো না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সে লক্ষ করলো, জাহাজ চলতে শুরু করেছে। দেখেই আঁতকে উঠলো গুরুদাস এবং ছুটে এলো জাহাজের পেছন দিকে। কিন্তু ততক্ষণে কম্মকাবার। জাহাজ ঘাট ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। এখন জাহাজের পেছনে আর ডাঙ্গা নেই। শুধুই পানি আর পানি।

চিৎকার দিয়ে উঠলো গুরুদাস। আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলো– আমি বাড়ি যাবো! আমাকে নামিয়ে দাও, আমাকে নামিয়ে দাও।

চিৎকারে তার চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে বললো– আরে এই ব্যাটা, কে তুই? এটা কি নদী, না এই জাহাজ পারঘাটের খেয়া নাও যে, যখন তখন ঘুরে এসে কাউকে নামিয়ে দিলো বা তুলে নিলো? আর নামার কোন উপায় নেই।

গুরুদাস আবার চিৎকার করে বললো– ওরে বাপরে! তাহলে আমার কি হবে?

জাহাজের জনৈক কর্মচারী প্রশ্ন করলো– কি হবে মানে?

Boighar & BABD

গুরুদাস বললো– আমি আবার কখন আমাদের পাড়ে ফিরে আসবো?

: কখন? আর ফিরে আসবে না।

: মানে?

: মানে? এই আসাই তোমার শেষ আসা; আর ফিরে যাবে না।

: ওরে বাবা। ওরে মা! আমি মরে যাবো। আমি মরে যাবো!

গুরুদাস এন্তার চিৎকার করতে লাগলো। এই সময় জাহাজের মালিক শেখ আবদুল আজিজ সাহেব সেখানে এসে বললেন– কি হয়েছে? কে ওটা? এত চিৎকার করছে কেন?

উপস্থিত লোকজন ঘটনাটা শেখ সাহেবকে বর্ণনা করে শুনালেন। ঘটনা শুনে শেখ সাহেব যার পর নেই ক্ষেপে গেলেন। সক্রোধে বললেন– এত ভ্যালা ফ্যাসাদ! এ ব্যাটা তো আচ্ছা এক সমস্যার সৃষ্টি করলো। একে নিয়ে এখন আমি করি কি? কোথায় রাখবো একে?

গুরুদাস আবার 'আমি বাড়ি যাবো। আমাকে নামিয়ে দিন... আমাকে নামিয়ে দিন...' বলে চিৎকার শুরু করলো। শেখ সাহেব ধমক দিয়ে বললেন– আরে থাম ব্যাটা! বাড়ি যাবে! বাড়ি কোথায় পাবি?

একজন উপহাস করে বললো– ওকে একদম আজরাইলের বাড়িতে পাঠিয়ে দিন হুজুর।

আর একজন বললো– হুকুম দিন হুজুর, হাত পা বেঁধে ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিই। একদম আসল বাড়িতে চলে যাক।

শেখ সাহেব হতাশকণ্ঠে বললেন– শেষমেষ তাই করতে হবে দেখছি। এ ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি নে। জাহাজের পাটাতনে পড়ে থেকে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে ওটাই বরং ভাল।

গুরুদাস গগনভেদী চিৎকার তুলে বলতে লাগলো– আমাকে মেরে ফেললো। আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

এই সময় হাজী খলিল পীর সেখানে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– কি ব্যাপার? এ লোক এত চিৎকার করেছে কেন?

পীর দরবেশ গোছের মানুষ দেখে গুরুদাস তাঁর কাছে ছুটে গেল এবং বলতে লাগলো– আমাকে বাঁচান হুজুর, আমাকে বাঁচান! এঁরা আমাকে সমুদ্রে ফেলে দেবে।

পীর সাহেব বললেন– ফেলে দেবে মানে?

Boighar & BABD
শেখ সাহেব বললেন– শেষ অবধি তাই করতে হবে পীর সাহেব। ফেলে দেয়া ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখিনে।

এরপর ঘটনাটা বর্ণনা করে শেখ সাহেব ফের বললেন– একে এখন কোথায় রাখি আর কোথায় শোয়াই-বসাই, বলুন! ফেলে দেয়া ছাড়া তো আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিনে।

গুরুদাস বললো– ঐ শুনুন হুজুর, আমাকে সমুদ্রে ফেলে দেবে। আমি সাঁতার জানিনে। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবো।

অন্য একজন বললেন– সাঁতার জানলেও তুই বাঁচবিনে ব্যাটা। সমুদ্রে কেউ সাঁতরিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।

গুরুদাস এবার পাটাতনে বসে পড়ে দুই হাতে মাথা চপড়াতে লাগলো আর বিলাপ করে বলতে লাগলো– ওরে বাবারে, ওমা, ও দাদা! তোমাদের সাথে আর আমার দেখা হলো না, আর দেখা হলো না।

পীর সাহেব এবার শেখ সাহেবকে বললেন– হাজার হোক, এটা একটা ইনসান শেখ সাহেব! কোন হিংস্র আর অবাঞ্ছিত জীবজন্তু নয়। একে এভাবে মরতে দেয়া যায় না। একে আমার হাতে দিন।

: আপনার হাতে মানে?

: একে আমি আমার কাছে রাখবো। আমার কামরায় তো শোয়া বসার পৃথক আসন আছে।

শেখ সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– এই একটা নোংরা জংলী মানুষকে? আপনি বিব্রত বোধ করবেন না?

: না শেখ সাহেব। গোসলের মাধ্যমে সাফ করে ভাল লেবাস পরালে আর নোংরা জংলী থাকবে না। আর আমারও অস্বস্তির কিছু থাকবে না।

: আলহামদুলিল্লাহ! আপনি আমাকে বাঁচালেন পীর সাহেব। নর হত্যার দায় থেকে আপনি আমাকে বাঁচালেন। আপনি তাকে আপনার কামরায় স্থান দিলে, ওকে নিয়ে আর আমার কোন সমস্যা হবে না। আপনি যা খাবেন, এই লোকও তাই খাবে। পোশাকও অনেক আছে এই জাহাজের গুদাম ঘরে।

: আমার থলেতেও বাড়তি পোশাক আছে শেখ সাহেব। পোশাক নিয়েও কোন সমস্যা হবে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শেখ আবদুল আজিজ সাহেব বললেন– আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ!

তাই করা হলো। গোসলের মাধ্যমে সাফ করে নতুন পোশাক পরালে গুরুদাস আর নোংরা বা জংলী রইলো না। রীতিমতো ভদ্রলোক বনে গেল। কিন্তু কামরায় এনে তাকে তার নির্দিষ্ট আসনে বসালেও বিলাপ তার থামলো না। 'আমি বাড়ি যাবো, আমি বাড়ি যাবো' বলে সে গুমরে কাঁদতে লাগলো।

অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। ইতোমধ্যে ক্ষুধাও তার পেয়েছিল চূড়ান্ত। তাই আহারের সময় খাবার আনা হলে এবং তাকে তা দেয়া হলে পীর সাহেবের সেই সুস্বাদু খাবার সে অনেক পরিমাণে সাগ্রহে খেয়ে নিলো। এরপর একটু পরেই শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ঘুম থেকে উঠার পর আবার শুরু হলো গুরুদাসের বিলাপ। সে অবিরাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো আর কেবলই বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। উঠে সে বসলোও না, তার মুখ থেকে কোন কথাও বের করা গেল না।

দিন দুই তিন এভাবে গেল। এরপর একদিন দেখা গেল তার কান্নাকাটি থেমে গেছে এবং আপন মনেই উঠে বিছানায় বসে আছে। তা দেখে পীর সাহেব খুশি হলেন। প্রশ্ন করলেন– আরে এই যে গুরুদাস বাবু, বাহ! তুমি ভাল হয়ে গেছো?

গুরুদাস সঙ্গে সঙ্গে ধরা গলায় প্রশ্ন করলো– আমি কি আর জীবনেও বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না হুজুর? কোন দিনই না?

পীর সাহেব বললেন– পারবে না কেন? অবশ্যই পারবে। তবে অনেক দেরি হবে। অনেক দিন পরে অবশ্যই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।

: অনেক দিন? অনেক দিন কয় বছর হুজুর? পাঁচ দশ বছর কি?

পীর সাহেব হেসে বললেন– আরে না না। পাঁচ দশ বছর কি বলছো? মাত্তর মাস ছয়েক পরেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।

নিজের কানকে বিশ্বাস করাতে পারলো না গুরুদাস। সে আবার প্রশ্ন করলো– কি বললেন হু-জু-র? মাস ছয়েক?

পীর সাহেব জোর দিয়ে বললেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাস ছয়েক। আবহাওয়া নিতান্তই খারাপ হলে বড়জোর আর দশ পনেরো দিন বেশি লাগতে পারে।

গুরুদাসের চোখে মুখে রক্ত ফিরে এলো। উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সে। আপন মনে বলতে লাগলো– মাত্র ছয় মাস? জয় গুরু, জয় গুরু! এ আর কয়দিন! দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

: কি বললে?

Boighar & BABD

: আর আমার কোন দুঃখ নেই হুজুর। ছয় মাস এমন কোন বেশি দিন নয়। শুনেছি, আমাদের রাজা জমিদারের কারাগারে অনেকের বছরের পর বছর কেটেছে। সেখানে শুধুই যন্ত্রণা। খাবার শোবার কোন ব্যবস্থা নেই। শুধুই বেত্রাঘাত।

: আচ্ছা!

: অথচ এখানে কি চমৎকার বসার জায়গা আর পেটপুরে কি সুস্বাদু খাবার খাওয়া! জীবনেও এত ভাল থাকার জায়গা আমি পাইনি, এত ভাল ভাল খাবারও খাইনি। এ ছয় মাস কোন দিক দিয়ে কেটে যাবে, আমি তা টেরই পাবো না, হুজুর।

পীর সাহেব খুশি হয়ে বললেন– সাব্বাস!

গুরুদাসের দিন অতঃপর সুখেই কাটতে লাগলো। কিন্তু আটকে গেল সুরমা রানীর দিন। দিন আর তাঁর কাটে না। সুরতান সাহেবকে হারিয়ে তিনি পুরোপুরি শয্যা নিলেন। সুরতান সাহেবের অভাবে আর আফসোসে মুমূর্ষু হয়ে গেলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করায় তাঁর জীবন সংশয় দেখা দিল।

উতলা হয়ে উঠলেন সুরমার মা। হরিদাসকে ডেকে তিনি বার বার বলতে লাগলেন– হরিদাস, আরে ও হরিদাস, কয়দিন খোঁজ করেই তোমরা হাত-পা ছেড়ে দিলে কেন? এদিকে যে মেয়েটা আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে?

হরিদাস ভয়ে ভয়ে বললো– কত্তা মা!

কত্তা মা বললেন– কোথায় কোথায় খুঁজে দেখেছো তুমি?

: সর্বত্রই কত্তা মা। আমাদের এই এলাকার সর্বত্রই পঁই পঁই করে খুঁজেছি। আমি একা তো নই, আমরা অনেক লোক কয়েকদিন যাবত সর্বত্রই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও ঐ কত্তার কোন সন্ধান পাইনি।

: শুধু আমাদের এলাকার সর্বত্র খুঁজেছো? আর কোথাও খুঁজোনি?

: আর কোথায় খুঁজবো কত্তা মা?

ভিন এলাকাতেও তো যেতে পারে সে। আমরা তাকে হিন্দু বানাবো ভয়ে আমাদের এলাকা ছেড়ে সে অন্য এলাকাতেও তো যেতে পারে। পারে না?

একটু চিন্তা করে হরিদাস বললো– আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা মা, তা পারে বৈকি? বড় মোক্ষম কথা বলেছেন। পূজো নেয়ার ভয়ে উনি ভিন এলাকাতেই যেতে পারেন।

সুরমার মা কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন– তাহলে বসে আছো কেন? অন্য এলাকাতেও খোঁজ করে দেখো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। পাওয়া গেল না বলে চুপ করে থাকলে কেন তোমরা? মেয়েটা যে মারা যায় আমার।

: তো কি করবো কত্তা মা।

: বেরিয়ে পড়ো। অন্য লোক না পাও, আমাদের বাড়ির আরো দুই তিন জন চাকর-বাকর সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। খোঁজ করো, খোঁজ করো। মেয়েটাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টাটা করো। হায় ভগবান, এইভাবে কি বেঘোরেই মারা যাবে মেয়ে আমার! হে জগদীশ্বর! হে ভোলানাথ! দয়া করো, দয়া করো।

সুরমার মায়ের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। চঞ্চল হয়ে উঠে হরিদাস বললো– যাচ্ছি কত্তা মা, দুই তিন জনকে নিয়ে আমি এখনই যাচ্ছি। আপনি এদিকে ঈশ্বরকে ডাকুন আর ওদিকে আমরা তন্ন তন্ন করে ঐ কত্তার খোঁজ করি। ভগবান হয়তো শেষ মেষ আমাদের প্রতি সদয় হতেও পারেন।

দু'জন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো হরিদাস। চার দিকের ভিন এলাকায় গিয়ে খুঁজতে লাগলো দিনের পর দিন। সুরতান সাহেবের চেহারা ও বয়স বর্ণনা করে নানা জনের কাছে খোঁজ নিতে লাগলো। অবশেষে একদিন হঠাৎ করেই ফলে গেল সুরমার মায়ের অনুমান। হ্যাঁ, সুরতান সাহেব ভিন এলাকাতেই এসেছিলেন। একজন সদাশয় ব্যক্তি বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ রকম বয়সের আর চেহারার এক যুবক মরো মরো অবস্থায় আমাদের চৌরাস্তায় পড়েছিল। অনাহারে অনিদ্রায় তার সজ্ঞালুপ্তি ঘটেছিল। লোকমুখে শুনে লোকজনসহ আমি গিয়ে তাকে বাড়িতে তুলে আনি। উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা আর খাদ্য পানীয় পাওয়ার ফলে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! জ্ঞান ফিরে আসার পরই, আমার বাড়ি হিন্দু বাড়ি জেনে সে এখান থেকে পালিয়ে গেল। কোথায় গেল সে খোঁজ আর আমি জানিনে।

শুনেই হরিদাসরা আবার বেরিয়ে পড়লো খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে পাশের এলাকায় যেতে তারা দেখে, এক দিঘীর ধারে ভিড় করছে কিছু লোক। কি ঘটনা– দেখার জন্যে সেখানে গিয়েই দেখে, সুরতান সাহেব। মরে পড়ে আছেন সুরতান সাহেব। কয়েকটা মাছি বসেছে তার মুখে আর লোকজন তা ভিড় করে দেখছে। চিৎকার করে উঠে হরিদাসেরা তাকে তুলতে গিয়ে দেখলো, জয় প্রভু! না, একেবারে মরেননি। তার প্রাণটা এখনো আছে। তার নাড়ীটা নড়ছে, তবে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞাহীন।

Boighar & BABD

সঙ্গে সঙ্গে দিঘী থেকে পানি এনে মুখে দিলে নড়ে উঠলো তার জিহ্বা এবং ঐ অবস্থাতেই জিহবা নেড়ে নেড়ে কিছু পানি পান করলেন সুরতান সাহেব। তিনি অনাহারেই মারা যাচ্ছেন বুঝতে পেরে পাশের এক বাড়ি থেকে কিছু দুধ চেয়ে আনলো হরিদাস। দুধ মুখে দিলে বেশ কিছুটা দুধ ঐ অবস্থাতেই চুক চুক করে পান করলেন তিনি। এরপর তখনই তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে অতি দ্রুত বাড়িতে ফিরে এলো হরিদাসেরা।

সুরতান সাহেবকে পাওয়া গেছে শুনেই ছুটে এলেন বাড়ির লোকজন। তাকে মুমূর্ষু দেখে তখনই তারা শুরু করলেন সেবা-শুশ্রূষা। খবর পাওয়া মাত্র হাতির বল ফিরে এলো মরণোন্মুখ সুরমা রানীর দেহে। পড়িমরি উঠে এসে সুরমা রানী নিজের হাতে তুলে নিলেন সুরতান সাহেবের শুশ্রূষার ভার। সুরমা রানী ব্যথার সাথে লক্ষ্য করলেন, অনাহার অনিদ্রায় সুরতান সাহেবের আগুনের মতো দপদপে গায়ের রঙ আর ভরাট স্বাস্থ্য পোড়া কাঠের মতো শীর্ণ ও কালো হয়ে গেছে।

সকলের বিশেষ করে সুরমা রানীর প্রাণঢালা সেবায় সুরতান সাহেব আবার প্রাণ ফিরে পেলেন। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার পর সুরমার দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন তিনি। ঐ অবস্থাতেই বিছানা থেকে উঠে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করলেন সুরতান সাহেব।

কিন্তু আর তাকে পালিয়ে যেতে দিচ্ছে কে! সবলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সুরমা রানী বললেন– ভয় নেই, ভয় নেই। আর আপনাকে পূজো নিতে হবে না। আর আপনার ঈমান নষ্ট হবে না। আপনি যেমন মুসলমান আছেন তেমন মুসলমানই থাকবেন। আর আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

সন্দেহাকুল চিত্তে সুরতান সাহেব প্রশ্ন করলেন– তাই কি? সত্যিই?

জবাব দিলেন সুরমা রানীর মা। তিনি বললেন– হ্যাঁ বাবা, সত্যিই। এ ছাড়া সুরমাকেও আর আমরা হিন্দু রাখবো না। তোমার জন্যে সুরমা যখন পাগল, তখন সুরমাকে তোমার হাতেই দেবো। তোমার ধর্মই ধর্ম হবে ওর।

এরপর সুরমার মা সুরমার বাপকে নিয়ে বসলেন। সুরমার বাপকে তিনি বললেন– আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিষ্প্রয়োজন। সুরতানকে ছাড়া সুরমা যখন বাঁচে না, তখন মেয়েকে বাঁচাতে হলে ঐ মুসলমান ছেলের সাথেই বিয়ে দিতে হবে মেয়ের; আপনি কি বলেন?

Boighar & BABD
জবাবে সুরমার বাপ বললেন– আর বলাবলির কি আছে? মুসলমান পীর ধরে ওকে যখন নিলে তখনই আমি বুঝেছি ওটাও মুসলমান হয়ে যাবে। পুরোপুরি হিন্দু হতে কখনও পারবে না।

: তা যখন বুঝেছেন, তখন আর দ্বিমত করে কি করবেন। আদেশ দিন, ওকে সুরতানের সাথেই বিয়ে দিয়ে দিই।

: আমি দ্বিমত করছিনে। তবে আমার একটাই কথা, বিয়ে দেয়ার পর ওদের আর আমার বাড়িতে এক অন্নে রাখা সম্ভব নয়। তাহলে আমার জাতকুল থাকবে না। ওদের পৃথক অন্নে আর পৃথক বাড়িতে পার করতে হবে।

: অবশ্যই অবশ্যই, ওটা আমারও কথা।

বলা বাহুল্য, সুরতান সাহেবের সাথে ইসলামী মতে সুরমার বিয়ে দেয়ার পর ওদের পৃথক অন্নে ও পৃথক বাড়িতে পার করে দিলেন সুরমার পিতা মাতা। তারা ভেবে দেখলেন তাদের যেহেতু আর কোন সন্তানাদি নেই, তাদের অভাবে এই বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি সবই সুরমা আর সুরতান সাহেবের হবে, কাজেই ওদের যাবতীয় খরচ এখন থেকে এই সংসার থেকে চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আয়-উপায় করার ওদের কোন গরজ রাখলেন না।

শাদির পর সুরতান সাহেবকে একান্তে পেয়েই সুরমা বিবি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুরতান সাহেবের বুকে। সুরতান সাহেবকে দুই বাহুতে বেঁধে আবেগ ভরে বললেন– কি গো মিঞা, যাবেন? আর আমাকে একা ফেলে যাবেন পালিয়ে?

সুরমাকেও একইভাবে বাহু বন্ধনে বেঁধে সুরতান সাহেব বললেন– না না, আর কখনই আপনাকে ফেলে পালাবো না আমি। আর কখনোই না।

এদের শাদির পরই কয়েকদিন যাবত অঝরে ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো। ডুবে গেলো ডোবা-নালা খাল-বিল। ভরে গেল সরোবর। শান্তি ফিরে এলো লোকালয়ে। শান্তির হিল্লোল বইতে লাগলো সুরমাদের বাড়িতে। কিন্তু হাহাকারের রোল উঠলো গুরুদাসের পরিবারে। গুরুদাসের পিতামাতা আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন– আমাদের গুরুদাস বোধ হয় আর ইহলোকে নেই। আজ সাত আট দিন হলো হারিয়ে গেছে গুরুদাস। তার আর কোনই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কোন সন্ধানও দিতে পারছে না। আমাদের গুরুদাস নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই। হায় ভগবান! হায় জগদীশ্বর। একি শোক সাগরে ভাসালে আমাদের।

তাদের আর্তনাদে পাড়ার অনেক লোক এসে জড়ো হলো সেখানে। তারা জিজ্ঞাসা করলো, আজ হঠাৎ তোমরা কি করে জানলে, তোমাদের গুরুদাস বেঁচে

Boighar & BARD
নেই? সাত আট দিন যাবত সে নিখোঁজ, অথচ এ যাবত তো তোমরা কোন উচ্চবাক্য করোনি?
www.boighar.com

গুরুদাসের মা বললো– এ যাবত খোঁজাখুঁজি করছিলাম। খুঁজলেই পাওয়া যাবে এই ভরসাই ছিল আমাদের। কিন্তু সর্বত্র খোঁজ করার পর গুরুদাসের বাপ আজ ফিলে এসেছেন। তিনি বলছেন, গুরুদাস কোথাও নেই। কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও যায়নি। নিশ্চয়ই সে ডুবে মরেছে। এই প্রবল বর্ষণে নিশ্চয়ই সে ভেসে গেছে। সাঁতার জানে না গুরুদাস। ভেসে যাওয়া ছাড়া তার নিখোঁজ হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

শুনে সবাই হায় হায় করতে লাগলেন। এই সময় কোথা থেকে হঠাৎ এসে হাজির হলো ঢুলী দীনবন্ধু আর রমণী। এদের কথা শুনে দীনবন্ধু বললো– ভেসে যায়নি, ভেসে যায়নি। জাহাজে চড়ে সে আরব দেশে চলে গেছে।

এ কথার সবাই অর্থ জানতে চাইলে দীনবন্ধু বললো– পূজোর বায়না পেয়ে আমরা জাহাজ ঘাটের দক্ষিণে বেশ দূরে এক বাড়িতে ঢোল বাজাতে গিয়েছিলাম। জাহাজ ঘাটের পাশ দিয়েই পথ। যাওয়ার সময় দেখি, গুরুদাস বাবু হঠাৎ ঘাটে ভেড়ানো জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ব্যাপার কি, জানার জন্যে আমরা ঘাটে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু গুরুদাস বাবু জাহাজ থেকে আর নেমে এলেন না। জাহাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, তবু নেমে এলেন না।

উপস্থিত জনতার একজন বললেন– তার মানে! তোমাদের দেখার ভুল হয়নি তো?

গুরুদাস ও রমণী একসাথে বললো– আরে, ভুল হবে কেন? আমরা কি গুরুদাস বাবুকে চিনি নে? জাহাজের একদম কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা গুরুদাস বাবুকে জাহাজে উঠতে দেখলাম।

গুরুদাসের বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন– সে কি! কিসের জাহাজ ওটা?

দীনবন্ধু বললো– আরব দেশী ব্যবসায়ীদের জাহাজ ওটা। এখান থেকে মাল নিয়ে আরব দেশে গেল।
www.boighar.com

গুরুদাসের বাপ প্রশ্ন করলেন– কি করে সেটা জানলে?

দীনবন্ধু বললো– ঘাটের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম। আরো জানলাম, আরব দেশের মাল নিয়ে আবার এই চট্টগ্রামে ফিরে আসবে ঐ জাহাজ। যাতায়াতে মোটামুটি মাস ছয়েক লাগবে।

গুরুদাসের মা আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন– হায় হায়! আমার গুরুদাস বেঁচে থাকবে তো? ওকে মেরে ফেলবে না তো আরব দেশের ঐ মুসলমানেরা?

রমণী বললো– তা না ফেলতেও পারে। তবে এটা ঠিক যে, বেঁচে থাকলে ঐ মুসলমানদের সাথে থেকে, মুসলমানী খানা খেয়ে গুরুদাস বাবু পুরোপুরি মুসলমান হয়েই ফিরে আসবেন।

গুরুদাসের আত্মীয়-স্বজন সবাই এবার সবিস্ময়ে বলতে লাগলেন– সেকি, সেকি! মুসলমান হয়ে যাবে!

গুরুদাসের মা বললেন– তা হয় হোক! তবু বাছা আমার বেঁচে থাকুক আর ফিরে আসুক। এই তো পাশের বাড়ির সুরমাটা মুসলমান হয়ে গেল। তাতে কি হয়েছে? বাপ মায়ের সন্তান বাপ-মায়ের কোল জুড়ে আছে। মুসলমান হোক আর যাই হোক, আমার গুরুদাস জীবিত অবস্থায় ফিরে আসুক, আমি প্রাণঢেলে ঠাকুরের পূজো দেবো।

www.boighar.com

দীনবন্ধু বললো– ঠাকুরকে ডাকুন মা ঠাকরুণ, ঠাকুরকে ডাকুন। আমার বিশ্বাস গুরুদাস বাবু ঠিকই আবার আপনার কোলে ফিরে আসবেন।

: জয় প্রভু, জয় প্রভু! তাই যেন হয় প্রভু, তাই যেন হয়!

গুরুদাসের বাপ-মা এই আশাতেই বুক বেঁধে দিন কাটাতে লাগলেন।

৪

হাজী খলিল পীরের সাথে বড়ই আনন্দে দিন কাটছে গুরুদাসের। সুস্বাদু খাবার, মনোরম শোয়া বসার ব্যবস্থা আর পীর সাহেবের সাথে মন খোলা গল্প আলাপ। কোন দিক দিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে, তা টেরই পাচ্ছে না গুরুদাস।

দুই বেলা পূর্ণ আহারের সাথে সকালে বিকেলে যথা নিয়মে আছে নাশতা-পানির ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট দু'জন লোক এই আহার-নাশতা সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছে। আরো একজন লোক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত আছে পীরসাহেব আর তাঁর সাথে গুরুদাসের খেদমতে।

আহারের ব্যাপারে দু'জন নির্দিষ্ট লোক ছাড়াই নাশতা-পানি নিয়ে আর একজন অতিরিক্ত লোক আসে মাঝে মাঝেই। এই অতিরিক্ত লোকটা এক বিচিত্র লোক। সিঁদুরের মতো লাল টকটকে গায়ের রঙ আর সুন্দর চেহারা হলেও হুঁশ-বুদ্ধি বলতে তার প্রায় কিছুই নেই। এক একদিন সে এক একটা অঘটন ঘটায়। সাত চড়ে রা' কাড়ে না হেতু নিতান্তই ঠেকা কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়া হয়।

সেদিন নাশতা-পানি নিয়ে পীর সাহেবের কামরায় এলো এই অতিরিক্ত লোকটি। নাশতা-পানি সাজিয়ে রাখা থালাটি খাবার টেবিলে না রেখে সে রাখলো টিপয়ের উপর। আর তা রাখতে গিয়ে উল্টে গেল টিপয়। ফলে সমস্ত নাশতা-পানি পড়লো গিয়ে মেঝেতে। এতে চাকরটির কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। সে নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো– যা, পড়ে গেল হুজুর!

পীর সাহেব রুষ্টকণ্ঠে বললেন– পড়ে গেল তো নাচো, ধেই ধেই করে নাচো! গিদ্ধর কাঁহাকার! পালাও, ওসব তুলে নিয়ে পালাও এখান থেকে!

ঐ একই রকম নিরুদ্বেগের সাথে সে বললো– বহুৎ আচ্ছা হুজুর!

ক্ষিপ্রহস্তে সব গুছিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় লোকটি বললো– টাটকা নাশতা-পানি নিয়ে এখনই আবার আসছি, হুজুর!

পীর সাহেব এবার ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– জি-না, তোমার আর আসার দরকার নেই। ভাগো এখান থেকে...!

তেড়ে এলেন পীর সাহেব। পড়িমরি দৌড়ে পালালো লোকটা। গুরুদাস এবার বললো– লোকটার খুব দোষ নেই হুজুর! ভুল মানুষেরই হয়। ওর ভুল হয়ে গেছে।

পীর সাহেব বললেন– এসব মানুষের ভুল পদে পদেই হয়। এমন নির্বোধরা কখনই বুঝতে পারে না, ভুল হয়েছে তাদের।

: হুজুর!

: দেখছো না, এটা একটা নিরেট নির্বোধ? এর কথাবার্তা আর আচরণ দেখে কিছু বুঝতে পারছো না?

: জি হুজুর, পারছি। তবে নির্বোধটার চেহারাটা কিন্তু মারাত্মক। একেবারে মনকাড়া চেহারা।

: তা হোক, তা হোক! মাকাল ফলের চেহারা মনকাড়া লাল টুকটুকে হয়।

এ কথায় থমকে গেল গুরুদাস। সে সবিস্ময়ে বললো– একথা আপনি কোথায় পেলেন হুজুর? আপনি কি কখনো আমাদের পাড়ায় গিয়েছিলেন?

পীর সাহেবও সবিস্ময়ে বললেন– তোমাদের পাড়ায় মানে?

: মানে, আমরা যেখানে বাস করি। আপনি কি আমাদের সেই পাড়ায় কখনো গিয়েছিলেন?

: কেন, তা যাবো কেন?

: নইলে এ কথা কোথায় পেলেন? আমাদের পাড়ার এক প্রবীণ লোক ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন।

: কোন কথা?

: ঐ যে, 'তা হোক, মাকাল ফলের চেহারা মনকাড়া লাল টুকটুকেই হয়'– এই কথা?

: তাই নাকি? তা কেন তিনি এই কথা বলেছিলেন?

: আমার বাড়ির পাশেই এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার আছে হুজুর। তাদের বাড়িতে এক পাগল এসে জুটেছে। অতুলনীয় দর্শনধারী লোক। চোখ ধাঁধাঁনো চেহারা। কোন রাজপুত্রের নবাবপুত্রের চেহারাও বোধ করি এত সুন্দর হয় না। যেন সাক্ষাৎ আমাদের দেবতা। ঐ দেবতুল্য সুন্দর পাগলের আচরণ সম্পর্কেই তিনি ঐ কথাটা বলেছিলেন।

পীর সাহেব সহাস্যে বললেন– আচ্ছা। তা কি রকম তার আচরণ?

Boighar & BABD
: সে কথা আর কি বলবো হুজুর! পাগল তো, তাই অযাচিতভাবেই ও বাড়ির নানা রকম ফালতু উপকারে লেগে যান তিনি। ও বাড়ির আঙ্গিনায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা শস্যদানা রোদে দেয়া থাকলে, আপন গরজে উনি এসে নিকটবর্তী কুকুর-বিড়াল তাড়াতে থাকেন। মাথার উপরে চিল-কাক উড়তে দেখলে, ছোঁ মেরে খাদ্যদ্রব্য বা শস্যদানা নেবে বিবেচনায় উনি ঐ চিল কাকের দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকেন আর ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঐ চিল-কাকের পেছনে অবিরাম দৌড়াতে থাকেন।

: আজব তো!

: ওঁর ঐ পাগলামী দেখে একদিন আমরা হাসাহাসি করছিলাম। আমাদের হাসতে দেখে পাড়ার ঐ প্রবীণ লোকটি বলেছিলেন– পাগল অজ্ঞানদের নিয়ে কোন সুস্থ লোকের হাসিঠাট্টা করা মানায় না। আমি বলেছিলাম, তা ঠিক। তবে পাগলটার চেহারাটা কিন্তু মারাত্মক। একেবারে মনকাড়া চেহারা।

জবাবে ঐ প্রবীণ লোকটি ঠিক আপনার এই কথাই বলেছিলেন, হুজুর। বলেছিলেন– তা হোক, তা হোক, মাকাল ফলের চেহারা মনকাড়া লাল টুকটুকেই হয়।

: আচ্ছা। তা পাগলটা কি বদ্ধ পাগল?

গুরুদাস বললো– না হুজুর, না না। আসলে পাগল নন উনি। স্মৃতি বিলুপ্ত লোক হুজুর। স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই ঐ রকম বেখাপ্পা আচরণ করেন।

: আর অন্যদের সঙ্গে বিশেষ করে ঐ পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সে কেমন ব্যবহার করে?

: চমৎকার হুজুর, চমৎকার! বয়সী নারী-পুরুষের সাথে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন তো করেনই, বাড়ির চাকর-বাকরদের সাথেও সব সময় রসিকতা আর ঠাট্টা মশকরা করেন।

: যেমন?

: ঐ বাড়ির এক চাকরের নাম হরিদাস। আমার সমবয়সী আর আমার বন্ধুলোক। তাকে সব সময় ঠাট্টা করে বলে হাড়ির দাস। হাসেন আর 'হাড়ির দাস, ও হাড়ির দাস', বলে ডাকেন।

: তাই? তা তোমার সাথে তার পরিচয় নেই?

: আছে মানে কি হুজুর? ঐ একই রকম দহরম-মহরম। আমার নাম গুরুদাস। কিন্তু উনি আমাকে দেখলেই বলেন– গরুর দাস, ও গরুর দাস, এদিকে একটু এসো তো ভাই!

: বাঃ! এই রকম ব্যবহার?

: আজ্ঞে হুজুর, মধুর ব্যবহার। আর তা ছাড়া একা একা থাকলেই উনি সব সময় গলা ছেড়ে গান গান। বড়ই দরদী কণ্ঠে গান গায়।

: কি মহব্বতের গান?

: না হুজুর, না না। ধর্মীয় গান। আধ্যাত্মিক গান।

: আধ্যাত্মিক! বাহ! তুমি লেখাপড়া জানো নাকি? এমন শব্দ তো লেখাপড়া না জানলে বলা যায় না। অশিক্ষিতেরা এর মানেই বুঝে না। তুমি কি লেখাপড়া জানো?

: জি হুজুর, কিছুটা জানি। ছোটকালে বেশ কিছুদিন আমি টোলে লেখাপড়া করেছি। সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা। এখন টোলগুলো পাঠশালা হয়ে গেছে।

: সাব্বাস! ঐ লোক আধ্যাত্মিক গান গায়।

: গলা ছেড়ে দরদ দিয়ে গান, হুজুর।

: তাজ্জব! তা কোথা থেকে সে এসেছে!

: সেটা সঠিক জানিনে হুজুর। তবে ঐ পরিবারের একমাত্র সন্তান সুরমা রানী, মানে আমাদের সুরমা দিদি, ঐ স্মৃতিভ্রষ্ট লোককে সরোবরের ঘাট থেকে তুলে এনেছিলেন।

: তা আনুক। কিন্তু আসলে বাড়ি কোথায় ওর?

: এ কথা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি বলেন, অনেক দূরে, অনেক দূরে।

: অনেক দূরে কোথায়?

: সেটা উনি জানেন না। মানে, উনার মনে নেই। স্মৃতিভ্রষ্ট লোক তো! এখানে এলেন কি করে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, মাছের পিঠে চড়ে এসেছি।

চমকে উঠলেন পীর সাহেব। ফুটে উঠলো তাঁর দুই চোখ। বললেন– কি বললেন? মাছের পিঠে চড়ে?

: জি হুজুর! ঐ রকম আজগুবি কথাই মাঝে মাঝে বলেন। স্মৃতি হারানোর জন্যে মাথার তার এই গোলমাল দেখা দিয়েছে।

গুরুদাসের কথাগুলো পীর সাহেবের তেমন কানেই গেল না। ফের তিনি ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– উনি ধর্মীয় গান করেন বললে না?

গুরুদাস বললো– আজ্ঞে হুজুর, সব সময়ই করেন।

: কি গান করেন তা কি তোমার মনে আছে? মানে দুই একটা গানের দুই একটা কথা?

Boighar & BABD

: বেশি গান তো করেন না। একটা গানই তাকে বার বার করতে শুনেছি।

: কি গান, কি গান? বলতে পারো সে গানের কিছুটা? পীর সাহেবের উত্তেজনা বেড়েই চললো।

গুরুদাস বললো– পারি হুজুর, সবটুকুই পারি।

: বলো তো শুনি।

গুরুদাস বলতে শুরু করলো–

রসূল নামের ফুল এনেছিরে–

আয়, গাঁথবি মালা কে?

ঐ মালা পরে রাখবি বেঁধে

আল্লাহ তায়ালাকে–

আয়, গাঁথবি মালা কে?

গুরুদাস গানটি শেষ না করতেই পীর সাহেব চিৎকার করে বলে উঠলেন– গুরুদাস!

গুরুদাস চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন পীর সাহেব কেবলই থর থর করে কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতে হাজী খলিল পীর ফের প্রশ্ন করলেন– নাম কি তাঁর? নাম?

: সুরতান সাহেব, হুজুর।

: সুরতান সাহেব!

: আমরা তাকে সুরতান সাহেব বলেই ডাকি। আগে নাকি ঐ নামে তাঁকে কেউ কেউ ডাকতো। সেই জন্যে আমরা তাকে সুরতান সাহেব বলেই ডাকি। আসল নাম তাঁর শাহ সুলতান।

ফের চিৎকার করে পীর সাহেব বললেন– 'শাহ সুলতান, মাহি সওয়ার!' ওরে গুরুদাস এই সেই লোক, এই সেই লোক। দীর্ঘদিন যাবত আমি যে তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

: হুজুর?

: আগে কেন একথা বলোনি? আগে কেন এ খবর দাওনি আমাকে? আমি ঐ ডাঙ্গায় থাকতে?

: ডাঙ্গায় থাকতে?

: হ্যাঁ ডাঙ্গায় থাকতে। এখন যে তোমার চেয়ে আমারই চট্টগ্রাম জাহাজ ঘাটের ডাঙ্গায় ফিরে যাওয়ার ঢের বেশি গরজ দেখা দিয়েছে।

: সে কি হুজুর?

: আর সেকি! হায় হায়! এখন আমি কি করি? কি করে ফিরে যাই! আমি কি এখন ঝাঁপ দেবো সাগরে? সাঁতরিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে যাবো?

: কেন হুজুর, আপনার এত গরজ কি কারণে?

: কী কারণে? আমার তো আরবে ফিরে যাওয়ার কোন গরজ নেই। সেখানে আমার কোন কাজ নেই। এখন আমার একমাত্র গরজ ঐ জনাব শাহ সুলতান সাহেবের কাছে ফিরে যাওয়া।

: সে কি হুজুর, সেকি?

: আমার একমাত্র কাজ ছিল ঐ জনাব শাহ সুলতান সাহেবের খোঁজ করা। হায় হায়! সে কাজ ফেলে এ আমি কোথায় যাচ্ছি!

: কে জনাব, উনি কে?

: রাজপুত্র। নবাবপুত্র। বলখ রাজ্যের রাজপুত্র।

ভয়ানক চমকে গেল গুরুদাস। বললো– রাজপুত্র! আমাদের ঐ সুরতান সাহেব রাজপুত্র?

পীর সাহেব বললেন– এখন উনি রাজা। আরবের বলখ রাজ্যের রাজা। রাজ্য ফেলে উনি এ দেশে ইসলাম প্রচারে এসেছেন।

: কি সাংঘাতিক! কি সাংঘাতিক কথা! উনি রাজা? স্বয়ং রাজা এখন আমাদের ওখানে? ঐ হতদরিদ্র বেশে আর ঐ রকম জঘন্য অবস্থায় আমাদের এলাকায় পড়ে আছেন একজন রাজা।

: হ্যাঁ, উনি রাজা। আরব দেশ থেকে উনি মাছের আকৃতি বিশিষ্ট জাহাজে চড়ে এদেশে এসেছেন।

: হুজুর!

: তাই উনি বলেছেন, মাছের পিঠে চড়ে উনি এ দেশে এসেছেন।

: কি তাজ্জব! কি তাজ্জব!

: উনার সাথে আমিও ঐ একই জাহাজে এদেশে এসেছি।

: তাই নাকি হুজুর, তাই নাকি?

: হ্যাঁ। রাজা বাহাদুরের আমি একান্ত সঙ্গী। একান্ত সঙ্গী হিসাবে দীর্ঘদিন যাবত আমি এদেশে আছি আর জনাবের সাথে সাথেই এ যাবত ছিলাম।

: তারপর হুজুর?

Boighar & BABD

: হঠাৎ একদিন হারিয়ে ফেললাম জনাবকে। এক আকস্মিক ঘটনায় মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল তাঁর; আর কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন তিনি।

: হুজুর!

: এখন শুনছি, উনি এখন তোমাদের ওখানেই আছেন। তুমিই তা বলছো।

: আজ্ঞে, তাই আছেন।

: কি গজব! এ কথা আগে জানলে কি আমি এই জাহাজে উঠি? এখন এই জাহাজ চট্টগ্রামে ফিরবে ছয় মাস বা সাড়ে ছয় মাস পরে। এতদিন উনি তোমাদের ওখানে থাকলে হয়। মাথা খারাপ মানুষ, কখন আবার কোন দিকে যায় তার ঠিক কি? ওখান থেকে আবার হারিয়ে গেলে তো আর পাবো না।

: হুজুর!

: এখনই যেতে পারলে পেয়ে যেতাম তাঁকে।

: না হুজুর, এখন গেলেও তাঁকে পেতেন না।

: মানে?

: এখন উনি আমাদের পাড়ায় নেই। কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন আবার।

আবার চমকে উঠলেন পীর সাহেব। বললেন– হারিয়ে গেছেন মানে? কি গজব! কেন হারিয়ে গেলেন, তা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা?

: শুধু বুঝতে পারা নয় হুজুর। আমি আর আমার পাড়ার সবাই তা জানি। স্বচক্ষে দেখেছি আমরা সবাই, প্রকাশ্য ঘটনা হুজুর।

: প্রকাশ্য ঘটনা?

: জি হুজুর। মস্ত এক ঘটনায় উনি দৌড় দিয়ে পালিয়ে যান।

: ঘটনা! কি ঘটনা?

: সে অনেক কথা হুজুর! উনি আমাদের এমন অসম্ভব আর অলৌকিক দু'টি উপকার করেন, যা করা একমাত্র দেবতাদের পক্ষেই সম্ভব। সেই উপকার পেয়ে সবাই উনাকে দেবতাজ্ঞানে পূজো দিতে গেলেন। কিন্তু উনি মুসলমান। পূজো নিলে উনার ধর্ম নষ্ট হবে ভয়ে উনি প্রাণপণে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেলেন। পিছে পিছে গিয়েও আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

: বলো কি! কি সে দু'টি উপকার।

গুরুদাস তখন সুরমার মাকে সাপের ছোবল থেকে রক্ষা করার আর গয়ানাথের আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে গোটা পাড়াটা রক্ষা করার ঘটনাগুলো এক এক করে বর্ণনা করে গেল। এরপর বললো– এতবড় উপকার একমাত্র দেবতা ছাড়া

Boighar & BABD

মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয় হেতু, সবাই তাঁকে দেবতা জ্ঞানে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পূজো দিতে গেলেন। আসল উদ্যোগ ঐ সুরমা দিদিমণিই নিলেন। আর পাড়ার লোকজন তাঁকে সাহায্য করতে এলেন। দিদিমণি তাঁকে তুলসী তলায় বসিয়ে ফুল আর শাঁখ-ঘণ্টা নিয়ে পূজো দিতে উদ্যত হলে, পাড়ার লোকজন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঐ হুজুরকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরতে এলেন। বিপদ বুঝে উনি সবলে উঠে ঝড়ের বেগে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেলেন আর হারিয়ে গেলেন।

পীর সাহেব হতাশকণ্ঠে বললেন– ও কি! কি বদনসীব! সন্ধান পেয়েও ধরতে পারলাম না জনাবকে। আরব থেকে ফিরে এসে আবার যে কোথায় আর কোনদিকে খুঁজতে যাবো তাঁকে। কি গজব, কি গজব!

গুরুদাস বললো– অন্য কোথাও যেতে হবে না হুজুর। এবার খুঁজলে শুধু আমাদের এলাকাতেই খুঁজতে হবে তাঁকে।

: অর্থাৎ?

: আমার বিশ্বাস, নিকটে না হোক, আমাদের এলাকার দূরবর্তী কোন স্থানেই উনি আছেন। অন্য কোথাও যাননি।

: তা কি করে হবে? ইতোমধ্যে যদি তাঁর স্মৃতি ফিরে থাকে, তাহলে তো নিজের রাজ্যেও ফিরে যেতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে দেশে গিয়ে সেখানেও তো তাঁকে পেতে পারি!

: পাবেন না হুজুর। সেখানে তিনি যাননি।

: কি করে বুঝলে?

: সেখানে যেতে হলে তো জাহাজে চড়ে যেতে হবে হুজুর। স্মৃতি ফিরে আসার ধারণা দিদিমণিরও হয়েছিল। তাই তিনি খোঁজ নিতে জাহাজ ঘাটেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে সেই লোকেরা জেনেছে গত দুই মাসের মধ্যে কোন জাহাজ চট্টগ্রাম জাহাজ ঘাটে আসেনি। ইদানীং আপনাদের এই জাহাজটাই ঘাটে এসেছে। এ জাহাজ ছেড়ে দিতে মাসখানেক দেরী আছে। জাহাজের মালিক বাজার থেকে আর দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যবসায়ের মালপত্র কিনছেন।

: আচ্ছা!

: মাত্র পনের বিশ দিন আগের ঘটনা হুজুর। এ জাহাজই কেবল ছেড়েছে। এই জাহাজ ছাড়া দুই মাসের মধ্যে আর কোন জাহাজ আসেনি। কাজেই, উনি জাহাজে চড়ে কোথাও গেলে তা যাবেন কি করে হুজুর!

Boighar & BABD

: তা হলে?

: নিশ্চয়ই উনি আমাদের এলাকাতেই দূরবর্তী কোন স্থানে পড়ে আছেন। আগে তো উনি দীর্ঘদিন রাস্তাঘাটেই পড়ে থেকে দিন কাটিয়েছেন, হুজুর। এখনও কোথাও রাস্তাঘাটে বা কোন ভাগাড়ে পড়ে থেকে পচে মরছেন।

: গুরুদাস!

: কোথাও পচে মরে না থাকলে, উনি আমাদের এলাকাতেই আছেন, হুজুর। যতদিনেই হোক, আবার চট্টগ্রামে ফিরে গেলেই আমরা তাঁকে পাবো– একথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি।

: তোমার কথাই যেন ঠিক হয় গুরুদাস। আল্লাহ তায়ালা যেন এমনটিই করেন।

: করবেন হুজুর, করবে না! আপনার মতো এমন পুণ্যবান লোককে তিনি কখনই দুঃখ দেবেন না। এটা আমার স্থির বিশ্বাস।

: আমিন!

: কি বললেন হুজুর?

: কিছু না। আল্লাহ তায়ালা যেন তোমার বিশ্বাসই মঞ্জুর করেন, এই কথা বললাম।

: ও আচ্ছা। তা মানে...

: কি? বলো?

: দয়া করে বলুন তো হুজুর উনি কে আর কি তাঁর ইতিহাস। রাজা হয়ে দেশ ছাড়লেন, মানে ইসলাম প্রচারে এলেন, আর ঘুরতে ঘুরতে আমাদের এলাকাতে এসে পড়লেন, আগাগোড়া ইতিহাসটা কি?

: শুনবে?

: জি হুজুর। দয়া করে বললে বড়ই কৃতজ্ঞ হতাম। উনার কাহিনীটা শুনার দুর্বার আগ্রহ হয়েছে আমার।

: কিন্তু সে কাহিনী মস্ত বড় কাহিনী গুরুদাস। প্রথম থেকে শেষতক বলতে গেলে দুই এক দিনে শেষ হবে না। মাসাধিক কাল লাগবে।

: তবু যদি থেমে থেমে বলতেন হুজুর...

: থেমে থেমে বলা ছাড়া একটানা বলা সম্ভব নয়। দুর্বল শরীর আমার। সেই থেমে থেমে বললে, মানে বেশ কিছুদিন পরপর খানিক খানিক করে বললেও দুই তিন মাসেও কুলাবে না।

Boighar & BABD

: তবু যদি কয়া করে...

: হ্যাঁ, বলবো। থেমে থেমেই বলবো। আজ কিছুটা শুনো–

অতঃপর কাহিনী শুরু করলেন হাজী খলিল পীর–

রাজ্যের নাম বলখ। আরব দেশের এক সমৃদ্ধ রাজ্য। বয়স হয়েছে রাজার। রাজা অর্থ নবাব। গুরুদাসের বুঝার সুবিধার্থে হাজী খলিল পীর নবাবকে বরাবর নবাব বলে গেছেন। বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছেন রাজা। তাই একদিন তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান এবং সাবালক সন্তান শাহজাদা শাহ সুলতানকে ডেকে পাঠালেন।

রাজা তাঁর খাস কামরায় আরাম কেদারায় বসেছিলেন। শাহজাদা শাহ সুলতান তাজিমের সাথে সেখানে প্রবেশ করে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। রাজা হাতের ইশারায় শাহ সুলতানকে পাশের একটি আসনে বসতে বললেন। শাহ সুলতান আসন গ্রহণ করলে রাজা বাহাদুর বললেন– আমার বিশ্বাস, শাহজাদা শাহ সুলতান, এখন রীতিমত সাবালক হয়েছেন। অতীতের সেই হাটি হাটি পা-পা শিশুটি আর তিনি নন!

শাহ সুলতান তাজিমের সাথে বললেন– জাঁহাপনা কি বলতে চান, তা বললে বাধিত হবো।

রাজা বললেন– বাধিত হওয়া না হওয়া সেটা শাহজাদার ইচ্ছা। কিন্তু আমি ভেবে তাজ্জব হই, অবশ্য করণীয় থেকে শাহজাদা এখনও কোন জ্ঞানে দূরে থাকতে পারেন! বৃদ্ধ পিতার ঘাড়ে তামাম দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে এখনও তিনি কোন বিবেচনায় হাওয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন! পিতাকে সাহায্য করা কি তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না?

: সাহায্য অর্থে জাঁহাপনা কি বলতে চান, আমার তাহলে সেটা জানা প্রয়োজন।

: সাহায্য মানে রাজকার্যে সাহায্য। দরবার চলার সময় রাজ-দরবারে আমার পাশে বসাটাও একটা সাহায্য।

: সেটা কি খুবই প্রয়োজন জাঁহাপনা?

: আমার প্রয়োজন না থাক, শাহজাদার প্রয়োজন আছে। আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। আমার অভাবে শাহজাদাই রাজা হবেন এ রাজ্যের। তাঁকেই চালাতে হবে রাজ-দরবার। সুতরাং রাজ দরবারের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি শিক্ষা করাটা শাহজাদার একান্ত প্রয়োজন।

Boighar & BABD

: গোস্তাকী মাফ হয় জাঁহাপনা। দরবারের ঐসব মান্ধাতা আমলের রীতিনীতি আর নিয়ম-কানুনগুলো শিক্ষা করার মতো কোন বিষয় বলে মনে করি না আমি।

: সেগুলো শিক্ষার বিষয় নয়?

: না জাঁহাপনা। সব কিছুই শিক্ষার বিষয় নয়। লেখাপড়া শিক্ষার বিষয়, তলোয়ার চালানো শিক্ষার বিষয়, লড়াইয়ের কায়দা কৌশল-সৈন্য চালানো শিক্ষার বিষয়। ঐসব শিক্ষা করা আর ঐসবের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। তলোয়ার চালানো শিক্ষা করা প্রয়োজন আর আমি তা প্রতিদিন যথা নিয়মে করি।

www.boighar.com

: ব্যস! স্রেফ এগুলোই? আর কোন কিছুর অনুশীলনের প্রয়োজন নেই?

: আছে। গান গাইতে হলে রেওয়াজ করতে হয়। নাচতে হলে অনুশীলন করতে হয়, ভেল্কীবাজি দেখাতে হলেও অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু ওসব কিছু করার কিছুমাত্র ইচ্ছাও তো আমার নেই। আমি কেন ওসব কিছু শিখতে বা অনুশীলন করতে যাবো?

নাখোশ হলেন রাজা। রুষ্টকণ্ঠে বললেন– খামুশ! কোন ফালতু উপমা শুনতে আমি শাহজাদাকে ডাকিনি। দরবারের নিয়ম-কানুন শিক্ষা করার জন্যে দরবারে না এলেও, উজির, নাজির, সেনাপতি আর দরবারের অন্যান্য সদস্যদের মতলব মানসিকতা উপলব্ধি করার জন্যে দরবারে আসা একান্ত প্রয়োজন। কারণ দু'দিন পরে শাহজাদাই রাজা হবেন আর এসব বিভিন্ন মতলব মানসিকতার দরবারীদের তাঁকেই সামাল দিতে হবে।

: নিষ্প্রয়োজন! জাঁহাপনার দরবারের সকল দরবারীকে আমি চিনি। তাদের মতলব মানসিকতার খবরও বেশ কিছু রাখি। তারা অনেকেই কুচক্রী আর মতলববাজ। সমস্যা সৃষ্টি করাই তাদের স্বভাব। তবে কোন রাজদরবারের সদস্যই শতকরা একশ'ভাগ সৎলোক হয় না। সুতরাং তাদের চরিত্র উপলব্ধি করার জন্যে রাজ-দরবারে আসার কোন প্রয়োজন আমি দেখিনে।

: অর্থাৎ?

: অর্থাৎ তাদের চরিত্র অবগত হওয়াটাই তাদের সামাল দেয়ার বড় পন্থা নয়। একমাত্র শক্ত ব্যক্তিত্বই পারে তাদের সামাল দিতে। কঠোর চরিত্র আর কঠিন ব্যক্তিত্বের সামনে কুচক্রী মতলববাজ সকলেই খামুশ হয়ে থাকে। আলাভোলা স্বভাবের আর দুর্বল চারিত্রের রাজা হলে তারা মাথায় উঠে বসে। পয়দা করে হাজারটা সমস্যা আর সীমাহীন বিশৃঙ্খলা।

: অর্থাৎ শাহজাদা দরবারে আসতে মোটেই আগ্রহী নন?

Boighar & BABD

: জাঁহাপনা সেটা উপলব্ধি করলেই আমি ধন্য হবো।

: অপদার্থ! আর বাক্যলাপে রুচি নেই আমার। শাহজাদা এখন এখান থেকে যেতে পারেন।

রাজা বাহাদুর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কুর্নিশ করে তাঁর খাস কামরা থেকে তাজিমের সাথে বেরিয়ে গেলেন শাহজাদা শাহ সুলতান।

অতঃপর রাজা বাহাদুর তাঁর বেগমকে ডেকে নিয়ে বললেন– বেগম, শাহজাদা শাহ সুলতানকে নিয়ে আমি তো বড়ই সমস্যায় পড়লাম। সে আমার কাছে আসতেই চায় না। সারাদিন সে করে কি?

বেগম বললেন– কি আর করবে! তার কাজ নিয়ে সে মশগুল হয়ে আছে।

: তার কাজ! কি তার কাজ?

: দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ নেয়া আর বাদবাকী সারাদিন আল্লাহ রসূলের জিকির-আসকার নিয়ে বিভোর হয়ে থাকা। শুয়ে থাকলেও গুন গুন করে সে আল্লাহ রসূলের গানই গায়। এর বাইরে কি তার আর কোন কাজ আছে, না আর কোন দিকে লক্ষ্য আছে তার!

: ঘর-সংসার নিয়ে কি তার কোনই চিন্তা নেই? রাজ্যটার ব্যাপারেও কি সে কিছুই ভাবে না?

: এক বিন্দুও না। তাকে সংসারী করার অনেক চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি। রাজ্যের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়ার কথা তাকে অনেক বলেছি। ভবিষ্যতে তাকেই রাজা হতে হবে বলে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু আমার কথায় সে কখনো কর্ণপাত করেনি। নিজের ভাব নিয়েই সে থেকেছে শুধু। নিজের ভাবের বাইরে জাররামাত্র আসেনি।

: তাহলে? ঘর সংসার রাজ্যপাট ছেড়ে কি সে দরবেশ হবে?

: সেই আলামতই দেখা দিয়েছে। জিকির-আসকার নিয়ে দিনরাত যে রকম বিভোর হয়ে থাকে, তাতে সেই সম্ভাবনাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

: তা উঠলে হবে কেন? সে আমাদের একমাত্র সন্তান। আর দ্বিতীয় কোন সন্তানাদি নেই আমাদের। আমার অভাবে এ রাজ্যের ভার কে নেবে? কে রাজা হবে? রাজ্যটা কি শেষমেষ অন্যের হাতে চলে যাবে? সে দরবেশ হয়ে গেলে রাজ্যটা তো অন্যের হাতেই চলে যাবে। অন্যে দখল করে নেবে এ রাজ্য।

: সে চিন্তা কি আমি করছিনে জনাব? সে চিন্তায় আমার আহার নিদ্রা দিন দিন হারাম হয়ে যাচ্ছে। তাকে সংসারী করতে না পারলে, তার ঐ আধ্যাত্মিক ভাব

ছুটাতে না পারলে, এ রাজ্যের আর আমাদের ভবিষ্যত একদম অন্ধকার। কি যে করি?

রাজা জোর দিয়ে বললেন– চিন্তা করো, চিন্তা করো। কিভাবে তাকে সংসারী করা যায়, সেটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো।

বেগম সাহেবা বললেন– কি দেখবো? পথ তো কিছু পাইনে।

এই বলে বেগম সাহেবা ক্ষণিকের জন্যে নীরব হয়ে রইলেন। এরপর হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বললেন– পেয়েছি, পেয়েছি জনাব, মোক্ষম পথ পেয়েছি।

: পেয়েছো? কি পথ?

: শাদি দিতে হবে। শাহজাদা শাহ সুলতানকে শাদি দিতে হবে। বউ ঘরে এলে ঐ দরবেশী ভাব তার আপছে আপ ছুটে যাবে। বউই তাকে সেটা ছুটিয়ে ছাড়বে।

রাজা বাহাদুর উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন– সাব্বাস বেগম! খাশা খাশা!

বেগম বললেন– মহব্বতের জালে বাঁধা পড়লে সংসারী হতে তার দুই দিনও লাগবে না।

: মোক্ষম পথ! মোক্ষম পথ। বেগম সাহেবার চিন্তা শক্তির তারিফ না করে আমি পারছিনে। সত্যি! শাহজাদাকে শাদি দিলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।

: তাহলে সেই ব্যবস্থাই করুন। অতি সত্বর শাহজাদাকে শাদি দিন।

: অবশ্যই অবশ্যই। এখনই আমি সে ব্যবস্থা করছি। উজির সাহেবকে নিয়ে এ ব্যাপারে আজই বসছি।

তাই করলেন রাজা বাহাদুর। পরক্ষণেই তিনি বালাখানায় গিয়ে বসলেন। উজির সাহেবকে ডেকে পাঠালেন সেখানে। উজির সাহেব এলে সামনের আসনে তাঁকে বসার ইংগিত করে রাজাবাহাদুর বললেন– উজির সাহেব! আমি অচিরেই শাহজাদা শাহ সুলতানকে শাদি দিতে চাই। আপনি অতি সত্বর সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন গুণবতী মেয়ে খুঁজে বের করুন। শাহজাদাকে সংসার ধর্মে ফিরিয়ে আনার মতো তার গুণ থাকা চাই।

আসন গ্রহণ করে উজির সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– খোঁজ করে কি অতি সত্বর এমন মেয়ে পাওয়া সম্ভব জাঁহাপনা? এ কাজে সময় লাগবে। তাছাড়া মেয়ে পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে না এলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়ে খোঁজা তো সম্ভব নয়।

: অর্থাৎ?

Boighar & BABD

: কার ঘরে বিবাহযোগ্য গুণবতী কন্যা আছে, সেটা জানতে হলে ঘুরে ঘুরে খোঁজ করতে হবে আর সেটা কঠিন ব্যাপার!

: আরে কি বলেন? এত কম বুদ্ধি নিয়ে আপনি উজিরগিরি করেন কি করে, তাই ভাবি!

হাসতে লাগলেন রাজা আর থতমত করে উজির বললেন– জাঁহাপনা!

: ঢোল দিন, ঢোল দিন। দেশের ভেতরে-বাইরে ঢোল দিয়ে বলুন– 'শাহজাদা শাহ সুলতানের জন্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন গুণবতী পাত্রী চাই।' ঢোল কানে পড়লে যাঁর ঘরে এমন পাত্রী আছে, নিশ্চয়ই তিনি প্রস্তাব নিয়ে ছুটে আসবেন।

: জি জাঁহাপনা, এটা ঠিক। ঢোল দিলে এমন পাত্রী পাওয়া সাত্যিই সহজ হবে। আমি আজই ঢোল দেয়ার ব্যবস্থা করছি জাঁহাপনা।

: হ্যাঁ, তাই করুন। আমি আর অধিক অপেক্ষা করতে পারছিনে।

কথায় বলে– 'দেশে দুভিক্ষ, খুলেছে দান ছত্র।' দান দিতে নাভিশ্বাস তো উঠবেই।

নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা হলো বলখের রাজারও। ঢোল পাওয়ার সাথে সাথে আনন্দে নেচে উঠলেন দেশ-বিদেশের অসংখ্য উজির-নাজির আমির উমরাহের দল। আওয়ারা হয়ে গেল তাঁদের বিবাহযোগ্য কন্যারা। পিতারা নেচে উঠলেন একজন ভবিষ্যত রাজাকে মেয়ের বর হিসেবে পাওয়ার আশায় আর মেয়েরা আওয়ারা হলো বর শাহ সুলতানের রূপচ্ছটায়। কিছু সংখ্যক মেয়ে আওয়ারা হলো বরের রূপ স্বচক্ষে দেখে। আর অধিকাংশ মেয়ে আওয়ারা হলো বরের রূপের কথা লোকমুখে শুনেই।

শাদির প্রস্তাব নিয়ে পঙ্গপালের মতো মেয়ের বাবারা ছুটে আসতে লাগলেন বলখের রাজপ্রাসাদের দিকে। কিছু কিছু অতি উৎসাহী মেয়েরাও সঙ্গ নিলো নিজ নিজ পিতার। ঢোল দেয়ার একদিন পরই বলখের রাজপ্রাসাদ সবগরম হয়ে উঠলো শাদির প্রস্তাব নিয়ে আসা আগন্তুকের ভিড়ে। বসার ঘরে জায়গা না হওয়ায় পাশের একটা বড় ঘরে আগন্তুকদের জায়গা দেয়া হলো। প্রস্তাব নিয়ে আসা আগন্তুকেরা একজন দু'জন হলে রাজা বাহাদুর তাঁদের সরাসরি ডেকে নিয়ে কথা বলতে পারতেন। যেহেতু সংখ্যায় তাঁরা অনেক সেহেতু একজন একজন করে তাঁদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে রাজা বাহাদুর বসার ঘরে বসলেন আর খাস বান্দার দ্বারা তাঁদের ডেকে নিতে লাগলেন। রাজা অবাক হয়ে দেখলেন, যাঁরা সাক্ষাৎ দিতে এসেছেন তাঁরা অনেকেই তাঁদের কন্যাকে সাথে করেই এনেছেন।

প্রথম যিনি সাক্ষাৎ দিতে এলেন তিনি তার কন্যাকে সাথে নিয়ে এলেন। রাজা বাহাদুর দেখলেন, সাদামাটা মেয়েকে সুন্দরী বানানোর জন্যে কন্যার গায়ে এত অলংকার চাপিয়েছেন যে, অলংকারের ভারে নুয়ে পড়েছে মেয়েটা। রাজা বাহাদুর তা দেখে বললেন– এ কি! অলংকারের ভারে যে মেয়েটা নুয়ে পড়েছে একদম!

সেটাকে চাপা দেয়ার জন্যে মেয়ের পিতা বললেন– না জনাব, অলংকারের ভারে নয়। আপনি তো গুণবতী মেয়ে চেয়েছেন জনাব। আমার মেয়ের এটি একটি গুণ। গুরুজনদের সামনে সে কখনো মাথা তুলে দাঁড়ায় না। সব সময় মাথা নিচু করে দাঁড়ায়।

: তাই?

: জি জনাব। তা ছাড়া, মেয়ের আমার সব চেয়ে বড় গুণ হলো, সে লজ্জাবতী মেয়ে। লজ্জা নারীর ভূষণ। মস্তবড় গুণ। আপনজন ছাড়া অন্য জনের সামনে এলে, মেয়ে আমার সব সময় নুয়ে পড়ে লজ্জায়।

: বটে!

: জনাবের কি পছন্দ হয়েছে আমার মেয়েকে? পছন্দ হয়ে থাকলে শাদির ব্যাপারে কথা বলি জনাব। শাদির দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলি!

রাজা বললেন– না, এখন নয়। আপনি এখন বাড়ি যান। আমার মতামত পরে আমি জানিয়ে দেবো।

আগন্তুক থতমত করে বললেন– জনাব!

রাজা বললেন– আরো অনেক লোক এসেছেন, তাতো জানেন। তাঁদের সাথেও কথা বলতে হবে। আপনারা এখন যান...! –বলেই রাজা বাহাদুর বান্দাকে বললেন– বান্দা, আর একজনকে আনো!

আর একজনকে আনতে গেল বান্দা। প্রথমজন অগত্যা বিদায় হলেন কন্যা নিয়ে।

দ্বিতীয়জনও হাজির হলেন কন্যাকে সাথে নিয়ে। এসেই তিনি সরাসরি বললেন– জনাব, গুণবতী মেয়ে চেয়েছেন! আমার এ মেয়ে অত্যন্ত গুণবতী মেয়ে জনাব। আমার মেয়ের মতো এতটা গুণবতী মেয়ে আপনি আর একজনও পাবেন না।

তাঁর আচরণে নাখোশ হলেন রাজা বাহাদুর। তবু মনের ভাব চেপে প্রশ্ন করলেন– কি গুণে গুণবতী মেয়ে আপনার!

আগন্তুক বললেন– গায়িকা জনাব। মস্তবড় সঙ্গীত শিল্পী। সঙ্গীত এমনই একটা জিনিস যার সুরে আকাশ থেকে বৃষ্টি পর্যন্ত নামিয়ে আনা যায়। এমনই গুণে আমার মেয়ে গুণবতী জনাব। এমনই গুণ আমার মেয়ের।

রাজা ম্লানকণ্ঠে বললেন– আপনার মেয়ে গায়িকা?

কথা বলার জন্যে মুখিয়ে ছিল মেয়ে। তার আর তর সইছিল না। তাই পিতা জবাব দেয়ার আগেই মেয়ে কলকণ্ঠে বলে উঠলো– জি হুজুর, জি জি! আমি অনেক গান জানি। অনেক অনেক।

: অনেক গান?

: জি জি। কাওয়ালী, ভাটিয়ালী, আধুনিক গান, বাউল গান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত– সব গান জানি আমি। আমার গলারও তারিফ করেন সবাই। একটা কাওয়ালী গাই– বুঝতে পারবেন...! –বলেই মেয়ে একহাত কানে লাগিয়ে এবং আর এক হাত প্রসারিত করে বিকট শব্দে গেয়ে উঠলো– আ– আ– আ–

চমকে উঠলেন রাজা। সক্রোধে বললেন– খামুশ! এটা কি গানের আসর যে গান গাইতে লেগেছো?

রাজার ধমকে থেমে গেল মেয়ে! মেয়ের বাপ বললেন– তা মানে, মেয়েকে আমার জনাবের পছন্দ হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে মতামত জানালে...

: পরে জানাবো। এখন বাড়িতে চলে যান, পরে জানিয়ে দেবো! –বলেই রাজা বাহাদুর বান্দাকে লক্ষ্য করে বললেন– আর একজনকে আনো...

অগত্যা কন্যাসহ চলে গেলেন দ্বিতীয়জন। এবার এলেন কন্যাসহ তৃতীয় জন। তৃতীয় আগন্তুক এসেই বললেন– আপনি গুণবতী মেয়ে চেয়েছিলেন না জনাব? এই যে নিন, গুণবতী মেয়ে কাকে বলে দেখে নিন।

রাজা বাহাদুর আর নাখোশ হলেন না। এদের চরিত্র ইতোমধ্যেই বুঝে নিয়েছেন তিনি। তাই সংযতকণ্ঠে বললেন– গুণবতী? কি গুণে গুণবতী আপনার কন্যা?

পিতা জবাব দেয়ার আগেই কন্যা সহাস্যে বললো– আমি একজন শিল্পী হুজুর। নৃত্যশিল্পী।

: নৃত্যশিল্পী?

: জি হুজুর। হিন্দু শাস্ত্রে আছে– নাচ দেখে স্বর্গের দেবতারাও মুগ্ধ হয়ে চলে যান। আমি এমনই শিল্পের শিল্পী হুজুর।

: নাচ!

Boighar & BABD

: জি জি। হরেক রকম নাচ। খেমটা, কত্থক, মনিপুরী– মানে হরেক রকম নাচ জানি আমি। কোন্ নাচ দেখতে চান, বলুন?

ঘাবড়ে গিয়ে রাজা 'তার মানে– তার মানে' করতে লাগলেন।

কন্যা বললো– তাহলে একটা খেমটা নাচই নেচে দেখাই। –বলেই নৃত্যের ভঙ্গিতে ঠ্যাং তুলে দাঁড়ালো মেয়েটা।

রাজা এবার রুষ্টকণ্ঠে বললেন– থাক থাক। তোমার গুণ আমার দেখা হয়ে গেছে। এবার তোমরা এসো।

পিতার আগেই কন্যা বললো– আমাকে পছন্দ হয়েছে হুজুর?

রাজা বললেন– পরে জানিয়ে দেবো। এবার যাও...! –বলেই বান্দাকে বললেন– বান্দা, আরেক জন...।

পরের জনও কন্যা সঙ্গে নিয়ে এলেন। কন্যার হাতে সারিন্দা। রাজা প্রশ্ন করলেন– হাতে ওটা কি?

কন্যার পিতা বললেন– বাদ্যযন্ত্র জনাব। ওটার নাম সারিন্দা। মেয়ে আমার যন্ত্র শিল্পী। মস্ত বড় গুণী মেয়ে আমার। –বলেই কন্যাকে বললেন– বাজাও তো মা, তোমার সারিন্দাটা বাজিয়ে জনাবকে শুনাও...!

বলার সাথে সাথে কন্যা 'প্যাঁ-পুঁ, ভ্যাঁ-ভুঁ' রবে বোল তুললেন সারিন্দায়।

ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ রাজা তাদের বিদায় করে দিলেন। পরের যে জন এলেন সেজন কন্যা সাথে আনলেন না ঠিকই, কিন্তু সাথে আনলেন এক বান্ডিল ছবি। এসেই তিনি বললেন– আমার মেয়ে যে গুণে গুণবতী সেটা হলো, সে একজন মস্তবড় চিত্রশিল্পী। মন মাতানো ছবি আঁকতে পারে সে। এই যে দেখুন তার নমুনা...! –বলেই বান্ডিল খুলে একটা একটা করে ছবি তুলে ধরতে লাগলেন রাজার সামনে। গাছের ছবি, নদীর ছবি, মাছের ছবি, মানুষের ছবি, ভূতের ছবি, ল্যাংটা ছবি, শ্লীল-অশ্লীল নানা রকম ছবি রাজার সামনে তুলে ধরতে লাগলেন তিনি।

আর ধৈর্য রাখতে না পেরে রাজা সগর্জনে বললেন– বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে...!

চমকে উঠে বেরিয়ে গেলেন চিত্রশিল্পীর পিতা। রাজা এরপর বান্দাকে বললেন– আর যাঁরা বাকী আছেন, তাদের সবাইকে বিদায় করে দাও। বলে দাও, আমি এখন ক্লান্ত। তাদের সাক্ষাৎকার নিতে আমি এখন অপারগ। তাদের পরে আসতে হবে আর আসার তারিখ পরে জানিয়ে দেয়া হবে।

শেষ হলো সাক্ষাৎ নেয়ার পালা। আর সাক্ষাৎ নিতে না গিয়ে রাজা বাহাদুর শুরু করলেন গোয়েন্দা মারফত খোঁজ করা। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম! সত্যিকারের সর্বগুণে গুণবতী রূপবতী ও চরিত্রবতী মেয়ে যখন পাওয়া গেল একটা তখন বেঁকে বসলেন শাহজাদা।

শাহজাদা শাহ সুলতান একবাক্যে জানিয়ে দিলেন– শাদি করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর নেই। আগ্রহ যখন হবে তখন সেটা জানিয়ে দেয়া হবে।

এরপরও পীড়াপীড়ি করা হলে শাহজাদা জানালেন, তিনি এক কথার মানুষ। একই কথা দুসরা বার বলা তাঁর শুধু স্বভাব-বিরুদ্ধই নয়, রীতিমতো রুচিবিরুদ্ধও বটে।

এই সাথে শেষ হলো শাহজাদাকে শাদি দেয়ার উদ্যোগও।

০ ০ ০

এই পর্যন্ত বলে হাজী খলিল পীর থামলেন এবং অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। কেন তিনি নীরব হয়ে রইলেন, সেটা খেয়াল না করে শ্রোতা গুরুদাস সশব্দে বললো– কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! এতসব কথা আপনি কি করে জানলেন হুজুর? এঁদের ভেতরের এতসব কথা? একটু বুঝিয়ে বলুন তো? বলুন তো হুজুর?

স্বপ্নোত্থিতের মতো পীর সাহেব বললেন– এ্যাঁ। কিছু বললে?

গুরুদাস বললো– বললাম মানে, ঐ রাজবাড়ির আর ঐ শাহজাদার ভেতরের এত কথা আপনি কি করে জানলেন, হুজুর?

পীর সাহেব ধীরে ধীরে বললেন– আমার বাড়ি যে ঐ রাজবাড়ির পাশেই গুরুদাস। ঐ বাড়ির অন্দরের বাইরের সব কথাই আমি জানি। ঐ শাহজাদাকেও আমি ছোটকাল থেকেই চিনি। উনার মন-মানসিকতাও জানি। যথেষ্ট পরিচয় ছিল তাঁর সাথে। তবে তখন পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার এত ঘনিষ্ঠতা ঘটেনি। –বলেই দু'হাত দিয়ে নিজের মাথার দু'পাশ চেপে ধরলেন খলিল পীর সাহেব। গুরুদাস আবার বললো– তাহলে সেই ঘনিষ্ঠতা ঘটলো কিভাবে, হুজুর?

পীর সাহেব ক্লান্তকণ্ঠে বললেন– আজ থাক গুরুদাস। আমার খুবই মাথা ধরেছে। আর কথা বলতে পারছিনে।

www.boighar.com

চমকে উঠলো গুরুদাস। এতক্ষণে সে খেয়াল করলো পীর সাহেবের অবস্থাটা। খেয়াল করেই যারপর নেই শরমিন্দা হলো সে। শশব্যস্তে বললো– জি হুজুর, থাক থাক। আজ তাহলে থাক! আজ একদম থাক।

৫

ভীষণ মাথা ধরায় হাজী খলিল পীর সাহেব সেদিন কথা বলা বন্ধ করলেন। মাথার যন্ত্রণা পুরোপুরিভাবে দূর হতে কয়েকদিন লাগলো। তারপরও পীর সাহেব গুরুদাসের প্রশ্নের জবাব তৎক্ষণাৎ দিতে গেলেন না। আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন। গুরুদাসও সাহস করে ঐ কাহিনী শুনানোর জন্যে বায়না ধরতে গেল না। এমনিতেই পীর সাহেবের অসুস্থতার উপর পরবর্তী ঘটনা শোনার জন্যে চাপ দিয়ে সে যে অপরাধ করে ফেলেছে, সেই অপরাধ আর সে বাড়াতে গেল না। সে একদম নীরব হয়ে রইলো।

দশ বারো দিন পরও পরবর্তী ঘটনা শুনার জন্যে গুরুদাস আর কোন ইচ্ছা প্রকাশ করলো না দেখে পীর সাহেবের হাসি পেলো। তিনি সহাস্যে বললেন– কি গুরুদাস, তুমি যে আর আমার কাছে আসছোই না?

সচকিত হয়ে গুরুদাস বললো– জি হুজুর, আসছি। মাথাটা কি টিপে দেবো?

পীর সাহেব বললেন– মাথা টিপে দেবে মানে?

গুরুদাস বললো– আপনার মাথা ধরেছিল, সেই জন্যে বলছি হুজুর।

: দূর পাগল! কবে সেই মাথা ধরেছিল আজও সেই মাথাব্যথা থাকে?

: তাহলে?

: তুমি সেই কাহিনী শুনবে না? শাহজাদা শাহ সুলতানের ইতিহাস?

খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো গুরুদাস। কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললো– কিন্তু আপনি যে অসুস্থ হুজুর? খুবই দুর্বল?

পীর সাহেব বললেন– দুর্বল আমি ঠিকই, কিন্তু আর আমি অসুস্থ নই। গল্প বলায় কোন অসুবিধা হবে না।

: সত্যি হুজুর? আবার গল্প বলতে পারবেন?

: পারবো, পারবো। বসার ঐ আসনটা নিয়ে এসে আমার কাছে বসো।

: আসছি হুজুর, আসছি। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাস বসার আসনটা নিয়ে এসে পীর সাহেবের কোল ঘেঁষে বসলো এবং বিপুল আগ্রহে বললো– বলুন হুজুর, বলুন!

পীর সাহেব বললেন– শাহজাদা শাহ সুলতানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতাটা কিভাবে ঘটলো সেটা জানতে চেয়েছিলে না?

: জি হুজুর, জি জি। কিভাবে?

: সেটা অনেক পরের ঘটনা গুরুদাস। ইতোমধ্যে অনেক পানি বয়ে গেছে নদী দিয়ে।

: হুজুর!

: সেই ঘনিষ্ঠতাটা ঘটার আগে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। অনেক কাহিনী আছে ঐ কাহিনীর আগে। সেসব কথা না বললে তো ঐ ঘটনায় যাওয়া যাবে না।

: তাহলে ঐসব ঘটনাই আগে বলুন, হুজুর। ঐ ঘটনার আগে যা যা ঘটেছে, দয়া করে সেসব কথাই আগে বলুন। আমি যে সব কথাই জানতে চাই।

: হ্যাঁ, তাই বলছি...।

আবার শুরু করলেন পীর সাহেব– শাহজাদা শাহ সুলতানকে শাদি দিতে না পেরে রাজা বাহাদুর হতাশ হয়ে এসে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। এরপর পানাহার বন্ধ করে আবোল তাবোল বকতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন– শাদিটাই যদি করলো না, সে তো রাজ্যের ভারও নেবে না। দরবেশ হয়ে যাবে সে আর এ রাজ্যটা দুশমনের হাতে পড়বে। না না, এটা হতে দেবো না আমি। কখ্খনো না।

ছটফট করতে লাগলেন রাজা। তা দেখে পাশে বসা তাঁর বেগম বললেন– কি হলো জনাব, আপনি এমন ছটফট করছেন কেন?

রাজা বাহাদুর বললেন– উজির সাহেবকে খবর দাও বেগম। আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি। জ্ঞান হারানোর আগেই এ রাজ্যটা আমি আমার আত্মীয়কে দান করে যাবো। উজির সাহেবকে ডেকে পাঠাও...

বেগম বললেন– আপনার আত্মীয় মানে? জনাবের তো কোথাও কোন নিকটাত্মীয় নেই! কাকে দান করবেন?

রাজা বললেন– আমার ভাগ্নে আলী ইমামকে। তাকে দিয়ে যাবো।

: আলী ইমাম! সে তো জনাবের কোন নিকট আত্মীয় নয়? জনাবের মরহুমা বোনের ননদের ছেলে। কোন রক্তের সম্পর্ক নেই।

: তা না থাক। তবু ওকে ছাড়া তো আত্মীয় বলে আর কোথাও কাউকে দেখিনে। একেবারে দুশমন দুর্জনের হাতে পড়ার চেয়ে রাজ্যটা আমার চেনাজনের হাতেই পড়ুক।

: কিন্তু ঐ আলী ইমামও তো কোন সৎ সুজন নয়। শুনেছি, অসৎ আর দুর্জনেরাই তার একান্ত সহচর।

: তাহলে আমি কি করবো? রাজ্যটা অরক্ষিত রেখেই আমি ইন্তেকাল করবো?

: অরক্ষিত থাকবে কেন? আমাদের সন্তান শাহজাদা শাহ সুলতান থাকতে রাজ্য অরক্ষিত থাকবে কেন?

: তুমি আমায় হাসালে বেগম! যে দরবেশ হয়ে পথে নামার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে আছে, সে আসবে রাজ্যের ঝামেলা মাথায় নিতে? সাগরে ঝাঁপ দেবে, তবু সে রাজা হতে আসবে না।

: জনাব!

: সুফী দরবেশ হওয়ার চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছে সে। প্রাণান্তেও সে মসনদে বসবে না।

: এটা জনাবের ভুল ধারণা। সে জ্ঞানবান ছেলে। মনোভাব তার যাই হোক, মসনদ অরক্ষিত রেখে সে কোনো দিকে যাবে না।

: বাজি?

: বাজি মানে?

: মানে, তুমি চেষ্টা করে দেখো। মসনদে বসতে তাকে যদি রাজী করাতে পারো, আমি বাজি ধরে বলছি, তোমাকে আমি মুক্তোর মালা উপহার দেবো। কিন্তু যদি না পারো?

: তাহলে কি হবে?

: আমাকে সোনার পয়জার গড়িয়ে দিতে হবে।

: মরণ! যে পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছে, তার আবার সোনার পয়জার পায়ে দেয়ার শখ!

: দুঃখে বলছি বেগম, দুঃখে বলছি। মসনদে বসতে তাকে যে রাজী করানো যাবে না, সেজন্যে বাজি ধরার কথা বলছি। নইলে যে লোক মৃত্যু পথের যাত্রী, তামাশা করার তার ফুরসুৎ কোথায়?

Boighar & BABD

: ক্ষান্ত হন জনাব। আপনি এতটা উতলা হবেন না আর আমিও বাজি ধরতে যাচ্ছিনে। আমি শুধু চেষ্টা করে দেখবো একবার তাকে রাজী করাতে পারি কি না।

: দেখো। দেখার যদি ইচ্ছে হয়, তুমি দেখতে পারো। আমার তাতে আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শয়ন করলেন রাজা বাহাদুর। দুই চোখ বন্ধ করে তিনি নীরব হয়ে রইলেন।

বেগম সাহেবা উঠে এসে দর্শনপ্রার্থীদের কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং উজির সাহেবকে খবর দিয়ে ঝরোকার আড়ালে বসলেন। উজির শেখ আবদুল্লাহ সাহেব এসে ঝরোকার ওপারে আসন গ্রহণ করলে বেগম সাহেবা বললেন– উজির সাহেব! আপনার মতো সুহৃদ আর বিজ্ঞজন থাকতে রাজা বাহাদুর কি শেষে আফসোস করেই জানটা দেবেন?

উজির শেখ আবদুল্লাহ সাহেব বললেন– বক্তব্যটা বোধগম্য হলো না আম্মা বেগম!

বেগম সাহেবা বললেন– রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাজা বাহাদুর অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছেন। আমাদের একমাত্র সন্তান শাহজাদা শাহ সুলতান দরবেশ হয়ে গেলে মসনদে কে বসবেন এই চিন্তায় তিনি আহার-নিদ্রা ছেড়েছেন। শাহজাদাকে কি রাজা হতে সম্মত করানো যাবেই না?

: কেন আম্মা বেগম, এ কথা বলছেন কেন?

: দেখতেই পাচ্ছেন, সংসারী করার জন্যে শাহজাদাকে শাদি দেয়া গেল না। এরপর রাজ্যের ভার নিতে যে সে রাজী হবে, এটা রাজা বাহাদুর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে পারছেন না। আর এই দুশ্চিন্তায় তিনি আহার-নিদ্রা ছেড়েছেন। তার অভাবে রাজ্যটা যে ভেসে যাবে এই তাঁর ভাবনা।

: তা, মানে...

: সুফী দরবেশ হওয়ার আলামত শাহজাদার মধ্যে ষোলআনা। দিন-রাত সে আল্লাহ তায়ালার জিকির-আসকার আর আল্লাহর রাসূলের (সা.) গান নিয়ে বিভোর হয়ে আছে। তার চিন্তা-চেতনাকে অন্যদিকে ফেরানোই যাচ্ছে না।

: তা আমাকে আপনি কি করতে বলেন, আম্মা বেগম?

: আপনি শাহজাদার পরম শ্রদ্ধেয় লোক। শাহজাদা আপনাকে যেমনই বিশ্বাস করে তেমনই ভালবাসে। আপনি বললে হয়তো সে ফেলতে পারবে না।

Boighar & BABD

: আম্মা বেগম!

: আমি রাজা বাহাদুরের কাছে কথা দিয়ে এসেছি, দরবেশ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে মসনদে বসতে তাকে রাজী করাবোই আমি। কিন্তু আমার কথা তো সে কখনোই মানে না। আপনি চেষ্টা করলে হয়তো সফলকাম হবেনই।

: তা, কথা হলো...

: আপনার উপর ভরসা করেই রাজা বাহাদুরকে কথা দিয়েছি আমি। এখন তাকে যদি রাজী করানো না যায়, তাহলে আমার মুখ তো থাকবেই না, রাজা বাহাদুরকেও বাঁচানো যাবে না।

: আম্মা বেগম!

: আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, এই আমার অনুরোধ।

: আমি কামিয়াব হবোই, এই আপনার বিশ্বাস?

: জি উজির সাহেব। এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়।

: দোয়া করবেন আম্মা বেগম, আমি যেন কামিয়াব হই।

ওখান থেকে উঠে উজির শেখ আবদুল্লাহ সাহেব সরাসরি শাহজাদা শাহ সুলতানের মহলে চলে এলেন। শাহজাদা তখন শুয়ে থেকে গুন গুন করে গাইছিলেন–

'রসূল নামের ফুল এনেছিরে–

www.boighar.com

আয়, গাঁথবি মালা কে?

ঐ মালা 'পরেই রাখবি বেঁধে

www.boighar.com

আল্লাহ তায়ালাকে–

আয় গাঁথবি মালা কে?'

উজির সাহেব সেখানে এসেই সহাস্যে বলে উঠলেন– মসনদে বসেও কিন্তু ঐ ফুলের মালা গাঁথা যায় শাহজাদা।

চমকে উঠে তাকিয়ে উজির সাহেবকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাদা শাহ সুলতান। সম্ভ্রমে সালাম দিয়ে বললেন– এ কি! হঠাৎ চাচাজান এখানে?

সালামের জবাব দিয়ে উজির সাহেব বললেন– আসতে হলো বাপজান। বাপজানের আব্বাজানকে বাঁচাতেই বাপজানের চাচাজানকে আসতে হলো।

: অর্থাৎ?

Boighar.BABD

: শাহজাদার এই আল্লাহ-প্রেম কি দুনিয়াদারীকে একদম বাতিল করে দেবে?

: দুনিয়াদারী আমার ভাল লাগে না চাচাজান।

: সেটা তো কোন সাচ্চা মুসলমানের কথা নয় বাপজান। ঈমানদারের প্রার্থনা হলো, 'ফিদ্দুনিয়া হাঁসনাতাও ওয়া ফিল আখেরাতে হাঁসনা তাও!' সেরেফ আখেরাত নিয়ে মশগুল থাকলে তো আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। এককভাবে আখেরাত নিয়ে থাকার অর্থ শুধু নিজের স্বার্থ দেখা। নিজের ভালাই দেখা। অন্যের ভালমন্দ দেখা নয়। সেরেফ নিজের ভালাই দেখে যারা আল্লাহ তায়ালা তো তাদের পছন্দ করেন না।

থমকে গেলেন শাহজাদা। থতমত করে বললেন– সুফী দরবেশরাও তো পরের ভালমন্দ দেখতে পারে চাচাজান। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মেহনত দেয়াটা কি অন্যের ভালমন্দ দেখা নয়? ইসলাম প্রচারে মেহনত করা মানেই তো অন্যের ভালমন্দ দেখা।

: হ্যাঁ, সেটা খানিকটা ঠিক। কিন্তু নিজের আশু কর্তব্য পালন না করে, নিজের গুরুজনদের হক আদায় না করে, ঐ পন্থায় অন্যের খেদমত করাটা এমন কোন বড় সওয়ারের কাজ নয়। অন্যের খেদমত করার আগে নিজের অসুস্থ পিতার খেদমত করাই বড় সওয়াবের কাজ। তাঁর হক আদায় না করে, তাঁকে সান্ত্বনা না দিয়ে, ইসলামের খেদমত কোন কায়েমী সওয়াব আনে না।

: চাচাজান!

: ইসলামের খেদমত করা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। কিন্তু অত্যন্ত পীড়িত পিতার খেদমত করা, মৃত্যুমুখী পিতার সান্ত্বনা বিধান করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। এই আশু কর্তব্য ঘাড়ে থাকলে, ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

: আপনার বক্তব্যটা স্পষ্ট হচ্ছে না চাচাজান! পিতার সান্ত্বনা বিধান মানে?

: মানে, শাহজাদার পিতা এখন মৃত্যুশয্যায়। তাঁর অভাবে মসনদে বসার কেউ নেই– এই চিন্তায় তিনি বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর অভাবে শাহজাদা মসনদে বসবেন– এই আশ্বাস শাহজাদা তাঁকে গিয়ে দিলে, তিনি বড়ই সান্ত্বনা পান আর স্বস্তির সাথে ইহধাম ত্যাগ করতে পারেন।

: সে কি চাচাজান! আমি গিয়ে তাঁর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলে আর তাঁর ইন্তেকালের পর আমি মসনদে বসবো– এই আশ্বাস দিলে তিনি খুবই তৃপ্তি আর স্বস্তি পাবেন?

: জি বাপজান। তিনি বড়ই আনন্দের সাথে ইহদুনিয়া ত্যাগ করতে পারবেন।

Boighar & BABD

: চাচাজান!

: তাঁর ইন্তেকালের পর ওয়াদা রক্ষার্থে শাহজাদা মসনদে বসে পরে অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা করলে কারো কিছু বলার থাকে না।

: আলহামদুলিল্লাহ! তাই হবে চাচাজান। আমার পিতার সান্ত্বনা আর স্বস্তি বিধান করতে আমি কোনদিনই অনাগ্রহী নই; বরং সততই আগ্রহী। আমি কখনো চাইনি যে, আমার পিতার হক আদায় না করে আমি সুফী দরবেশ হয়ে পথে নামবো!

: বাপজান!

: তিনি যে এতটা অসুস্থ আর এই মর্মবেদনায় আছে, তা আমাকে এতদিন কেউ জানাননি। আমি এখনই গিয়ে তাঁর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করবো আর মসনদে বসার ওয়াদাও তাঁকে দেবো।

: সাব্বাশ বাপজান, সাব্বাশ!

: মিথ্যা আশ্বাস তাঁকে আমি দেবো না চাচাজান। মসনদে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। একেবারেই ব্যর্থ হলে পরের চিন্তা পরে।

: সাব্বাশ বাপজান, সাব্বাশ!

শাহজাদাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমু খেলেন উজির শেখ আবদুল্লাহ সাহেব।

০ ০ ০

রাজা বাহাদুর বিছানায় পড়ে থেকে ধুঁকছিলেন। তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। বেগম সাহেবা পাখার বাতাস দিচ্ছিলেন রাজাকে আর তাঁর বুক নেড়ে দিচ্ছিলেন। এই সময় শাহজাদা শাহ সুলতান সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে বেগম সাহেবা বললেন– সোবহান আল্লাহ! শাহজাদা হঠাৎ এখানে! কি তার অভিযোগ?

শাহজাদা বললেন– অভিযোগ? হ্যাঁ, অভিযোগ তো আছেই। আব্বাজান এতটা অসুস্থ, তাতো আমাকে জানাননি আম্মাজান? এ কেমন আপনার আচরণ?

আম্মাজান নাখোশ হলেন। রুষ্টকণ্ঠে বললেন– আচরণ আমার যা-ই হোক, কেন তুমি এখানে এসেছো, চটপট সেটা বলে বিদায় হও। রাজা বাহাদুর কষ্টে আছেন, কষ্ট আর তাঁর বাড়িয়ো না।

: বিদায় হবো বলে তো আমি এখানে আসিনি আম্মাজান? আপনি সরে আমাকে ওখানে বসতে দিন।

: বসতে দেবো মানে?

: এখন থেকে আব্বাজানের সেবা-শুশ্রূষা আমি করবো। আমার হক আমাকে আদায় করতে দিন।

: সোবহান আল্লাহ! সূর্য আজ পশ্চিম দিকে উঠলো নাকি? ছেলে আমার বলে কি? আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে অনুক্ষণ বিভোর, হঠাৎ সে এসেছে পিতার খেদমত করতে! তামাশা আর দেখবো কত?

এদের কথাবার্তা এতক্ষণে খেয়াল করলেন রাজা বাহাদুর। অতি কষ্টে বললেন– কে এসেছে? কে এসেছে বেগম?

মায়ের জবাব দেয়ার আগেই জবাব দিলেন শাহজাদা। বললেন– আমি আব্বাজান। আমি শাহ সুলতান। আমি আপনার খেদমতে এসেছি। এখন থেকে আমি আপনার সেবা-শুশ্রূষা করবো।

: তুমি? তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করবে?

: জি আব্বাজান। যতদিন না আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন, ততদিন আমি আপনার সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকবো।

: বটে!

: সেবা-শুশ্রূষার পাশাপাশি হেকিম আনবো, দাওয়াই আনবো, আপনার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। আপনাকে পুরোপুরি সুস্থ করে না তুলে আমি এখান থেকে যাবো না।

: তাতে কি লাভ? সুস্থ হয়ে উঠে আমার লাভ কি? রাজ্যটাই আমার বেদখল হয়ে যায় যদি, সুস্থ হয়ে উঠে আমি কি করবো?

: কেন আব্বাজান? বেদখল হয়ে যাবে কেন?

: যাবে না? আমার পরে মসনদে বসার আর কেউ না থাকলে, থাকবে এই রাজ্য? দুশমন দুর্জনেরা দৌড়ে এসে রাজ্যটা দখল করে নেবে না?

: সে কি! মসনদে বসার কেউ না থাকলে মানে? আমি থাকতে মসনদে বসার কেউ থাকবে না কেন? আপনার পরে আমি মসনদে বসবো।

উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন রাজা বাহাদুর। বললেন– কি বললে? আমার পরে তুমি মসনদে বসবে?

: অবশ্যই আব্বাজান। আমি থাকতে মসনদ ফাঁকা থাকবে কেন?

: আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! তুমি সত্যি বলছো?

: আমি কখনো মিথ্যা বলি না আব্বাজান। আর আপনিও তা জানেন।

: সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! তাহলে তোমার আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা?

: সে চিন্তা-ভাবনার প্রতি আমার যত আকর্ষণই থাক, নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে নয়। আপনার পরে রাজ্যটা হেফাজত করা আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এত বড় কর্তব্য অবহেলা করে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা কোনই সুফল বয়ে আনবে না আমার জন্যে।

রাজা বাহাদুর যেন মরাদেহে প্রাণ পেলেন। তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন– মারহাবা, মারহাবা! আমার আর অসুখ নেই বাপজান! আমি সুস্থ হয়ে গেছি। একেবারেই সুস্থ হয়ে গেছি।

: আব্বাজান!

: আমার অসুখের কারণটা সম্পূর্ণই দূর হয়ে গেছে। আর কি অসুখ থাকে? আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছি।

শাহজাদা বাধা দিয়ে বললেন– এতটা উত্তেজিত হবেন না আব্বাজান! তাতে হঠাৎ কোন অঘটন ঘটতে পারে। –বলেই শাহজাদা তাঁর আম্মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– আম্মাজান! আপনি এবার বসুন এখানে। আব্বাজানকে থামিয়ে রাখুন। শুধুই সেবা দিয়ে হয় না। সেবা-শুশ্রূষার পাশাপাশি হেকিম-দাওয়াই দরকার। আমি হেকিম ডাকার ব্যবস্থা করে আসি, আপনি একটু বসুন।

বেরিয়ে গেলেন শাহজাদা। রাজা বাহাদুর তাঁর বেগমকে সহাস্যে বললেন– তুমি যাদু জানো, সেটা তো আমি জানতাম না বেগম। শাহজাদাকে একদম যাদু করে ফেলেছো! মুহূর্তেই কি সাংঘাতিক বদলে গেছে সে।

: যাবে না? সে তো অজ্ঞান ছেলে নয়। জ্ঞানবান ছেলে। ঠিকমতো বুঝাতে পারলে, সেকি না বদলে পারে?

: বুঝেছি। বাজিতে জিতে গেছো তুমি। মুক্তোর মালা তোমার পাওনা হয়ে গেছে। শিগ্‌গিরই সে ব্যবস্থা করছি।

: থাক, মুক্তোর মালার চিন্তা করতে হবে না জনাবকে। এ বাহাদুরী আমার নয়। পুরোটাই উজির শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের বাহাদুরী। পারলে তাঁকে এক সময় ইনাম দেবেন বড় একটা।

পরক্ষণেই হেকিম এসে রোগী দেখে দাওয়াই দিয়ে গেলেন। শাহজাদা শুরু করলেন রোগীর খেদমত করা। দাওয়াই খাওয়ানো, পথ্য খাওয়ানো, মুখ

Boighar & BABD

মোছানো, গা মোছানো, বাতাস দেয়া, হাত-পা টিপে দেয়া– এক কথায়, হরেক প্রক্রিয়ায় বিরামহীনভাবে রোগীর সেবা করতে লাগলেন শাহজাদা।

রাজা বাহাদুরের অসুখ ইতোমধ্যেই শতকরা পঁচাত্তর ভাগ উপশম হয়ে গিয়েছিল। শাহজাদার এই সেবার ফলে বাদবাকীও সেরে গেল। সহাস্যে বিছানায় উঠে বসলেন রাজা বাহাদুর। রাজপ্রাসাদের সর্বত্র আনন্দ হিল্লোল বইতে লাগলো।

কিন্তু সবই ক্ষণিকের বিদ্যুৎচ্ছটা মাত্র। নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেমন দপ করে জ্বলে উঠে তেমনই দপ করে জ্বলে উঠা। আসলেই রাজা বাহাদুরের দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ করেই তিনি আবার শয্যা নিলেন আর হঠাৎ করে মুমূর্ষু হয়ে গেলেন। কয়েকটা দিনও গেল না, দাওয়াই-পথ্য-শুশ্রূষা কোন কাজে এলো না। সকলকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন রাজা বাহাদুর।

দাফন কাফন ও করণীয় কাজ সমাধা করে শাহজাদা শাহ সুলতান ওয়াদা মাফিক মসনদে উঠে বসলেন। শক্ত মনোবল নিয়ে হাল ধরলেন রাজ্যের।

ভালই কেটে গেল কয়েকদিন। এভাবেই বরাবর কেটে যেতে পারতো। কিন্তু হঠাৎ করেই ধ্বংস নামলো শাহজাদার মনোবলে।

শাহজাদার আম্মাজান অর্থাৎ রাজা বাহাদুরের বেগম সাহেবা স্বামীর ইন্তেকালের পর শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন আর হঠাৎ করেই তিনিও পাড়ি জমালেন পরপারে। রক্তের সম্পর্ক বলে ইহধামে শাহজাদার আর কেউ রইলো না। ফলে শাহজাদার শক্ত মনোবল ধরে রাখার কোন উৎসও আর রইলো না। ধস নামলো সেখানে। গা-ঝাড়া দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন মসনদ থেকে।

উজির শেখ আবদুল্লাহকে ডেকে তিনি বললেন– চাচাজান! আমার খেল খতম! এবার যা করার আপনি করুন।

উজির সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– অর্থাৎ?

শাহজাদা বললেন– হাল ধরার শক্তি আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে চাচাজান! এবার আপনি হালটা ধরুন।

www.boighar.com

উজির সাহেব অনুমান করতে পেরেছিলেন অনেকটাই। তবু তিনি প্রশ্ন করলেন– কিছু বুঝতে পারলাম না শাহজাদা। কি বলতে চান, স্পষ্ট করে বলুন।

শাহজাদা বললেন– স্পষ্ট করে আর কি বলবো চাচাজান? বললে বলতে হয়– 'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।' এ রাজ্যের হাল ধরে রাখতে আমি আর পারলাম না চাচাজান। এবার আপনি হালটা ধরুন।

: আমি হাল ধরবো মানে?

: মানে, আপনি এবার মসনদে বসুন। ওয়াদা করেছিলাম, ওয়াদা রক্ষা করেছি। মসনদে টিকে থাকতে চেয়েছিও চিরদিন। কিন্তু আর পারলাম না। আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণাটা আমার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কোমরে রশি বেঁধে টানছে আমাকে। এবার আপনি এই মসনদে বসুন, আমাকে ছুটি দিন।

: আমি! আমি বসবো মসনদে?

: না বসলে রাজ্যটা বেহাত হয়ে যাবে চাচাজান! মসনদে বসে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আর আমার নেই। আমি চলে যাবোই। আমি চলে গেলে, আমার আব্বাজানের ভাষায় 'দুশমন দুর্জনেরা' দখল করে নেবে এই রাজ্যটা। আপনি এ রাজ্যের একান্ত সুহৃদ। মসনদ ফাঁকা রেখে আপনি এটা হতে দিতে পারবেন, চাচাজান!

: শাহজাদা!

: আপনি মসনদে বসুন। রাজ্যটা হেফাজত করুন।

: কিন্তু...

: আর কিন্তু কিন্তু করবেন না চাচাজান। আমার একান্ত অনুরোধ, আমার প্রতি এতটুকু স্নেহ যদি থেকে থাকে আপনার, আমার এ অনুরোধ রক্ষা করুন চাচাজান। মসনদে বসুন।

: এ কি দায়ে ঠেকালেন বাপজান?

: পিতার পরই আমার কাছে যে আপনার স্থান। পিতার পরই আপনি যে আমার আপনজন। এ দায় তো আপনাকেই বইতে হবে।

ক্ষণিক নীরব থেকে উজির সাহেব বললেন– ঠিক আছে বাপজান। এ রাজ্যটা হেফাজত করার দায়িত্ব আমি নিলাম। তবে ঐ মসনদে বসবো না। মসনদের পাশে ভিন্ন আসনে বসে রাজ্য চালাবো আমি। আপনার মসনদ আপনারই থাকবে।

: চাচাজান!

: অন্য কথায়, আপনার মসনদটা পাহারা দিয়ে রাখবো আমি। আপনি এলে, যখন বা যতদিন পরই আসুন, আপনার মসনদ ফাঁকা পাবেন আপনি। সেদিন আপনি আপনার মসনদে বসে ছুটি দেবেন আমাকে।

: তেমন দিন আর আসবে না চাচাজান। এ বাউল মন আর ঘরমুখী হবে না।

Boighar & BABD

: তবু আমি পাহারা দিয়ে রাখবো বাপজান। যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন পাহারা দিয়ে রাখবো। আমার ইন্তেকালের পর আর এ দায় আমার থাকবে না।

: আপনি দীর্ঘজীবী হোন চাচাজান। দীর্ঘকাল এ রাজ্যটা হেফাজতও করুন। পরম করুণাময়ের কাছে আমি এ প্রার্থনাই করি।

উজির সাহেব হাত তুলে বললেন– আমিন!

বিদায় আদায় নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পথে নামার সময় উজির সাহেব শাহজাদাকে বললেন– সুফী দরবেশ হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরার চেয়ে একজন পথ প্রদর্শকের নির্দেশনা নেয়া ভাল। শাহজাদা কারো নির্দেশনা নেবেন।

শাহজাদা বললেন– তেমন নির্দেশক আর পাবো কোথায় চাচাজান?

: আমার জানামতে, আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুফী দামেশকের শেখ তওফিক সাহেব। পারলে তাঁর মুরিদ হবেন।

: আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে তাই নেবো চাচাজান। আল্লাহ হাফেজ...!

: আল্লাহ হাফেজ!!

০ ০ ০

পথে নেমে শাহজাদা শাহ সুলতান, এক্ষণে রাজা শাহ সুলতান, উদ্দেশ্যহীনভাবেই পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন কয়েক দিন। এরপর তাঁর স্মরণ হলো উজির সাহেবের কথা। উজির সাহেবের নসিহত মোতাবেক দামেশকে গমন করলেন রাজা এবং হাজির হলেন বরেণ্য সুফী শেখ তওফিকের খানকায়। সালাম দিয়ে শেখ সাহেবের সামনে দাঁড়ালে শেখ সাহেব সালামের জবাব দিয়ে কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন রাজা শাহ সুলতানের দিকে। তারপর মোহিতকণ্ঠে বললেন– সোবহান আল্লাহ! এ কি ফেরেশতা প্রতীম চেহারা! কি অপূর্ব খুব সুরাত। কে আপনি জনাব? কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন?

রাজা শাহ সুলতান বললেন– বলখ থেকে হুজুর! আরবের বলখ রাজ্য থেকে।

সুফী প্রধান বললেন– মা'শা আল্লাহ! বলখের রাজা বাহাদুরের খবর কি? তিনি কি জীবিত আছেন?

মাথা নীচু করে রাজা শাহ সুলতান মলিনকণ্ঠে বললেন– জি না হুজুর! কিছুদিন আগে বলখের রাজা বাহাদুর ইন্তেকাল করেছেন।

Boighar & BABD
ব্যথিতকণ্ঠে শেখ তওফিক সাহেব বললেন– ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। আপনি কি রাজার কোন আত্মীয়?

: আমি ঐ মরহুম রাজার একমাত্র সন্তান।

: সোবহান আল্লাহ! তাই তো এই নূরানী চেহারা। নাম কি জনাবের?

: শাহ সুলতান, হুজুর।

: আপনি শাহজাদা শাহ সুলতান?

: শাহজাদাই ছিলাম। কিন্তু আব্বার ইন্তেকালের পর আমাকেই রাজা হতে হয়েছে বলখ রাজ্যের।

: সোবহান আল্লাহ! জনাব বলখের রাজা? তা হঠাৎ এই দীনের কুটিরে কেন এসেছেন জনাব?

: দীন তো আপনি নন হুজুর। অনন্ত আসমানী ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আপনার ভরপুর। আরব দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান আপনি, শ্রেষ্ঠ মানুষ।

সুফী সাহেব বিনম্র বচনে বললেন– তবু আমার তো কোন পার্থিব সম্পদ নেই জনাব রাজা। প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক আপনি। কেন আমার কুটিরে জনাব?

রাজা শাহ সুলতান ক্লিষ্টকণ্ঠে বললেন– ঐ প্রভূত সম্পদ আর রাজার মসনদ আমাকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারেনি হুজুর। ধন-সম্পদে আর রাজকীয় জাঁকজমকে অতিষ্ট হয়ে আমি মসনদ ছেড়ে পথে নেমে এসেছি হুজুর।

: বহুৎ খুব। তা আমার কাছে কেন জনাব?

: আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি হুজুর। হুজুরের মুরিদ হতে এসেছি।

: আপনি, আপনি আমার মুরিদ হবেন জনাব?

: সেই ইরাদা নিয়েই আমি এখানে এসেছি। হুজুরের কাছে আমি দীক্ষা নিতে চাই।

: ভেবে দেখেছেন তো সুগভীরভাবে? জনাব রাজা মানুষ। মসনদ ত্যাগ করে সুফী দরবেশের জীবন গ্রহণ করতে এসেছেন। অন্তরের গভীরে কোথাও তো জনাবের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লুক্কায়িত নেই?

: সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করেই আমি এসেছি হুজুর। দয়া করে আমাকে দীক্ষিত করুন।

রাজার একাগ্রতা দেখে সুফী শ্রেষ্ঠ শেখ তওফিক সাহেব আর না করতে পারলেন না। রাজাকে সুফী মতবাদে দীক্ষিত করলেন।

Boighar & BABD

: তবু আমি পাহারা দিয়ে রাখবো বাপজান। যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন পাহারা দিয়ে রাখবো। আমার ইন্তেকালের পর আর এ দায় আমার থাকবে না।

: আপনি দীর্ঘজীবী হোন চাচাজান। দীর্ঘকাল এ রাজ্যটা হেফাজতও করুন। পরম করুণাময়ের কাছে আমি এ প্রার্থনাই করি।

উজির সাহেব হাত তুলে বললেন– আমিন!

বিদায় আদায় নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পথে নামার সময় উজির সাহেব শাহজাদাকে বললেন– সুফী দরবেশ হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরার চেয়ে একজন পথ প্রদর্শকের নির্দেশনা নেয়া ভাল। শাহজাদা কারো নির্দেশনা নেবেন।

শাহজাদা বললেন– তেমন নির্দেশক আর পাবো কোথায় চাচাজান?

: আমার জানামতে, আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুফী দামেশকের শেখ তওফিক সাহেব। পারলে তাঁর মুরিদ হবেন।

: আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে তাই নেবো চাচাজান। আল্লাহ হাফেজ...!

: আল্লাহ হাফেজ!!

০ ০ ০

পথে নেমে শাহজাদা শাহ সুলতান, এক্ষণে রাজা শাহ সুলতান, উদ্দেশ্যহীনভাবেই পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন কয়েক দিন। এরপর তাঁর স্মরণ হলো উজির সাহেবের কথা। উজির সাহেবের নসিহত মোতাবেক দামেশকে গমন করলেন রাজা এবং হাজির হলেন বরেণ্য সুফী শেখ তওফিকের খানকায়। সালাম দিয়ে শেখ সাহেবের সামনে দাঁড়ালে শেখ সাহেব সালামের জবাব দিয়ে কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন রাজা শাহ সুলতানের দিকে। তারপর মোহিতকণ্ঠে বললেন– সোবহান আল্লাহ! এ কি ফেরেশতা প্রতীম চেহারা! কি অপূর্ব খুব সুরাত। কে আপনি জনাব? কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন?

রাজা শাহ সুলতান বললেন– বলখ থেকে হুজুর! আরবের বলখ রাজ্য থেকে।

সুফী প্রধান বললেন– মা'শা আল্লাহ! বলখের রাজা বাহাদুরের খবর কি? তিনি কি জীবিত আছেন?

মাথা নীচু করে রাজা শাহ সুলতান মলিনকণ্ঠে বললেন– জি না হুজুর! কিছুদিন আগে বলখের রাজা বাহাদুর ইন্তেকাল করেছেন।

Boighar & BABD

ব্যথিতকণ্ঠে শেখ তওফিক সাহেব বললেন– ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। আপনি কি রাজার কোন আত্মীয়?

: আমি ঐ মরহুম রাজার একমাত্র সন্তান।

: সোবহান আল্লাহ! তাই তো এই নূরানী চেহারা। নাম কি জনাবের?

: শাহ সুলতান, হুজুর।

: আপনি শাহজাদা শাহ সুলতান?

: শাহজাদাই ছিলাম। কিন্তু আব্বার ইন্তেকালের পর আমাকেই রাজা হতে হয়েছে বলখ রাজ্যের।

: সোবহান আল্লাহ! জনাব বলখের রাজা? তা হঠাৎ এই দীনের কুটিরে কেন এসেছেন জনাব?

: দীন তো আপনি নন হুজুর। অনন্ত আসমানী ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আপনার ভরপুর। আরব দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান আপনি, শ্রেষ্ঠ মানুষ।

সুফী সাহেব বিনম্র বচনে বললেন– তবু আমার তো কোন পার্থিব সম্পদ নেই জনাব রাজা। প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক আপনি। কেন আমার কুটিরে জনাব?

রাজা শাহ সুলতান ক্লিষ্টকণ্ঠে বললেন– ঐ প্রভূত সম্পদ আর রাজার মসনদ আমাকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারেনি হুজুর। ধন-সম্পদে আর রাজকীয় জাঁকজমকে অতিষ্ট হয়ে আমি মসনদ ছেড়ে পথে নেমে এসেছি হুজুর।

: বহুৎ খুব। তা আমার কাছে কেন জনাব?

: আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি হুজুর। হুজুরের মুরিদ হতে এসেছি।

: আপনি, আপনি আমার মুরিদ হবেন জনাব?

: সেই ইরাদা নিয়েই আমি এখানে এসেছি। হুজুরের কাছে আমি দীক্ষা নিতে চাই।

: ভেবে দেখেছেন তো সুগভীরভাবে? জনাব রাজা মানুষ। মসনদ ত্যাগ করে সুফী দরবেশের জীবন গ্রহণ করতে এসেছেন। অন্তরের গভীরে কোথাও তো জনাবের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লুক্কায়িত নেই?

: সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করেই আমি এসেছি হুজুর। দয়া করে আমাকে দীক্ষিত করুন।

রাজার একাগ্রতা দেখে সুফী শ্রেষ্ঠ শেখ তওফিক সাহেব আর না করতে পারলেন না। রাজাকে সুফী মতবাদে দীক্ষিত করলেন।

Boighar & BABD
দীক্ষা গ্রহণ করার পর রাজা শাহ সুলতান সুফী শ্রেষ্ঠ শেখ তওফিককে জিজ্ঞাসা করলেন– এখন আমার কাজ কি হবে হুজুর?

: কাজ?

: জি। আমাকে পথনির্দেশ দিন।

: এই আরব বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে সব অমুসলমান আছে, তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনাই হবে এখন থেকে জনাবের কাজ।

: কিভাবে হুজুর?

: তাদের কাছে ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছে দিয়ে আর ইসলামের শাশ্বত মাহাত্ম্য তাদের সামনে তুলে ধরে ইসলাম গ্রহণে তাদের উদ্বুদ্ধ করুন। দশ জন লোককেও যদি তাদের ভ্রান্ত মতবাদ, তথা অন্ধকার থেকে ইসলামের শাশ্বত আলোতে আনতে পারেন, তাহলে জনাব অশেষ সওয়াব হাসিল করতে পারবেন। কামাই করতে পারবেন পরকালের প্রভূত পাথেয়।

: তারা কি আমার নসিহতে কর্ণপাত করবেন, হুজুর?

: এখানেই নির্ভর করছে জনাবের বুদ্ধিমত্তা আর এখানেই অন্তর্নিহিত আছে ইসলাম প্রচারের প্রকৃত খেদমত।

: হুজুর!

: অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে আর সুমধুর ভাষায় ইসলামের মাহাত্ম্য তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এক বারের জায়গায় একজনের কাছে একাধিক বার যেতে হবে। নিজের হৃদয়ের ঈমানী উত্তাপ দিয়ে তাদের হৃদয়ের বরফ গলাতে হবে। তাহলেই তারা অন্ধকার থেকে আলোতে চলে আসবে।

www.boighar.com

০ ০ ০

দীক্ষা গ্রহণ করার পর আবার পথে নামলেন রাজা শাহ সুলতান এবং আরবের অমুসলমানদের মাঝে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুদিন এভাবেই গেল। এর পরই আবার তিনি ডাক পেলেন সুফী প্রধান শেখ তওফিক সাহেবের।

www.boighar.com

ডাক পেয়ে আবার তিনি হাজির হলেন শেখ তওফিক সাহেবের খানকায়। খানকা সব সময় লোকে লোকারণ্য থাকে। সেদিন একপাশে উপবিষ্ট একজন মাত্র লোক ছাড়া আর কোন লোক ছিল না। রাজা শাহ সুলতান সেদিকে নজর

Boighar & BABD
না দিয়ে শেখ তওফিক সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– কি হুকুম হুজুর? হুজুর আমাকে যে তলব দিলেন হঠাৎ? নতুন কোন কাজ আছে নিশ্চয়ই?

সুফী প্রধান শেখ তওফিক বললেন– হ্যাঁ, নয়া কাজই আছে জনাব। মস্ত বড় কাজ। আর সেই জন্যেই জনাবকে স্মরণ করেছি আমি।

: আদেশ হোক হুজুর!

: জনাবের কাছে এবার বাংলাদেশে গমন করার প্রস্তাব রাখতে চাই, অবশ্য জনাব যদি তকলিফ বোধ না করেন।

: কোনো তকলিফ নেই হুজুর। বলুন, কি কাজ করতে হবে সেখানে গিয়ে?

: ঐ ইসলাম প্রচারই করতে হবে জনাব। আরব বিশ্বের মধ্যে ইসলাম প্রচার করার চেয়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করার প্রয়োজন ঢের ঢের বেশি। আরব বিশ্বের মুসলমানেরা তবু পরোক্ষভাবে কিছুটা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত। ইহুদী-খৃষ্টানেরা আখেরী পয়গম্বরের না হলেও, আল্লাহ প্রেরিত কোন না কোন পয়গম্বরের বিকৃত মতের হলেও অনুসারী। কিন্তু...

: কিন্তু হুজুর?

: কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাসীরা একেবারেই আল্লাহবিমুখ। তারা পৌত্তলিকতা ও পুতুল পূজায় নিবেদিত প্রাণ মানুষ। এক কথায়, গুমরাহীর অথৈ সাগরে নিমজ্জিত তারা। শেরেকিতে নিমগ্ন এসব ইনসান ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রকৃত আলোর সন্ধান তারা কিছুমাত্র পায়নি। আল্লাহ তায়ালার বিন্দুমাত্র করুণা পাওয়ার সম্ভাবনাও তাদের নেই। ভ্রান্ত আর বাতিল পথ থেকে তাদের সহি পথে আনতে হবে। ইসলামের শাশ্বত আলোতে এনে তাদের সহি পথ দেখাতে হবে।

: বহুৎ খুব হুজুর। হুকুম হলে আমি অবিলম্বে বাংলাদেশে যাত্রা করবো।

: হ্যাঁ, করবেন। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার কোন সহজ কাজ হবে না জনাব। অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে। কঠিন প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হবে জনাবকে।

: অর্থাৎ?

: ইসলামের মাহাত্ম্য হৃদ্যতার সাথে আর সুমধুর ভাষায় তুলে ধরতে পারলে সাধারণ জনগণের তরফ থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা আসবে না। তারা হৃষ্টচিত্তেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তবে...

: তবে হুজুর?

Boighar & BARD

: বাধা আসবে শাসক গোষ্ঠীর তরফ থেকে। রাজা বা রাষ্ট্র প্রধানের তরফ থেকে। তারা মহারোষে জনাবের উপর চড়াও হবে।

: কারণ?

: কারণ মূলত দু'টি। প্রথম কারণ, তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মমত ত্যাগ করে কিছুতেই অন্য কোন মতবাদে আসতে চাইবে না। সাধারণ মানুষের মত অতি সহজেই ইসলামের মাহাত্ম্য তারা বুঝতে পারবে না বা কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। ইসলামকে তারা সহজভাবে নেবে না। ক্ষমতার অহংকার তাদের পাপ পথে ধাবিত করবে।

: আর দ্বিতীয় কারণ হুজুর?

: দ্বিতীয় কারণ হলো, যখনই তারা বুঝতে পারবে ইসলামে সকলেই সমান, বাদশাহ ফকির সকলেই এক কাতারের মানুষ, উঁচু নীচু কোন ভেদাভেদ নেই সেখানে, তখনই মাথায় তাদের আগুন ধরে যাবে। যে প্রজাদের মাথায় তারা অহর্নিশ পয়জার মরে চলেছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে, সেই প্রজাদের সাথে কোলাকুলি করতে হবে তাদের– এটা তারা চিন্তা করতেও পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে তারা তলোয়ার হাতে ছুটে আসবে জনাবের দিকে।

: হুজুর!

: তাদের দেশে ইসলাম প্রচার বন্ধ করার জন্যে সেনাসৈন্য নিয়ে তারা মার মার রবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে জনাবের উপর। একলা, অর্থাৎ এককভাবে সে দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে জনাব অধিক দিন পারবেন না। অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবেন।

: তাহলে?

: সৈন্যবাহিনী সঙ্গে রাখতে হবে। চৌকস ও সশস্ত্র একদল সৈন্য জনাবের পেছনে থাকতে হবে। একা গিয়ে জনাব সেখানে ইসলাম প্রচার করতে পারবেন না।

: সে কি! তাহলে শক্তি দিয়ে ইসলাম প্রচার করবো আমি? জোর করে তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবো?

শেখ তওফিক সাহেব ব্যথিত কণ্ঠে বললেন– এটা মোটেই জনাব-সুলভ কথা হলো না জনাব। শক্তি দিয়ে ইসলাম প্রচার করার জন্যে সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নেবেন– এমন চিন্তা করা জনাবকে মোটেই শোভা পায় না। শক্তি দিয়ে ইসলাম প্রচার হয় না। শক্তি দিয়ে ইসলাম প্রচার করলে সেটা ইসলাম প্রচার হয় না, জুলুমবাজি করা হয়। আর আল্লাহ তায়ালা তা বরদাশত করেন না।

Boighar & BABD

রাজা শাহ সুলতান বললেন– তাহলে সৈন্য বাহিনী সঙ্গে নেবো কেন হুজুর?

: তবুও জনাব এ প্রশ্ন করছেন? সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নেবেন আত্মরক্ষা করার জন্যে। জনাবের শান্তিপূর্ণ ইসলাম প্রচারে যে ক্ষমতাধরেরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, জনাবকে হত্যা করতে ছুটে আসবে, তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে সৈন্যবাহিনী সাথে রাখতে হবে। এক কথায়, শুধুই জালিমদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিতে হবে, কারো উপর জোর খাটানোর জন্যে নয়।

সুফী শ্রেষ্ঠ শেখ তওফিক সাহেবের এ কথায়, সুফী সাহেবের খানকায় সে সময় যে একজন মাত্র লোক একপাশে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন– সোবহান আল্লাহ! বড়ই কায়েমী কথা হুজুর। বিজ্ঞ হুজুরের এ কথা একেবারেই কায়েমী কথা।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা শাহ সুলতান সেই লোকের দিকে চোখ ফেরালেন। বললেন– কে, কে আপনি?

এরপরেই বলে উঠলেন– আরে, আপনি?

০ ০ ০

শ্রোতা গুরুদাসকে হাজী খলিল পীর শাহজাদা শাহ সুলতানের কাহিনী বর্ণনা করে শুনাচ্ছিলেন। এই পর্যায়ে এসে তিনি থেমে গেলেন এবং গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বললেন– গুরুদাস, বিখ্যাত সুফী শেখ তওফিক সাহেবের খানকায় এককোণে যে লোক উপবিষ্ট ছিলেন, জানো তিনি কে?

গুরুদাস বুঝতে না পেরে বললো– হুজুর!

খলিল পীর সাহেব বললেন– রাজা শাহ সুলতান সাহেব যাকে দেখে বললেন– 'কে, কে আপনি?' জানো সে লোক কে?

: কে হুজুর?

হাজী খলিল পীর হেসে বললেন– সে লোক আমি।

গুরুদাস বিপুল বিস্ময়ে বললো– সে কি হুজুর। আপনি!

: হ্যাঁ, আমি। তুমি বলেছিলে না, শাহজাদা শাহ সুলতানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটলো কিভাবে? এইভাবে গুরুদাস, এখানে আর এইভাবে।

: জয় গুরু, জয় গুরু! এইভাবে হুজুর?

Boighar & BABD

: বলি, তুমি শুনো।

আবার শুরু করলেন হাজী খলিল পীর সাহেব–

আমাকে দেখেই শাহজাদা বললেন– আরে, আপনি?

আমি বললাম– হ্যাঁ জনাব, আমি খলিল পীর। আপনার প্রতিবেশী।

সঙ্গে সঙ্গে সুফী প্রধান শেখ তওফিক সাহেব শাহজাদা শাহ সুলতানকে বললেন– শুধুই খলিল পীর নয়, হাজী খলিল পীর, জনাব। উনি ইতোমধ্যেই হজব্রত পালন করে ফেলেছেন।

শুনে খুশি হয়ে শাহজাদা সুফী সাহেবকে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! আপনি এ কে চেনেন হুজুর?

সুফী প্রধান শেখ তওফিক বললেন– চিনবো না কেন? জনাবের মতো এও তো আমার আর এক শিষ্য, মানে মুরিদ। অনেক আগেই ইনি আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

শাহজাদা বললেন– মারহাবা, মারহাবা!

এরপর শাহজাদা আমাকে বললেন– তা আপনি এখানে?

আমি বললাম– এখানেই কিছুদিন হলো আছি জনাব। আপনার মতো আমারও আর গৃহে মন টিকছে না। বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর প্রবল ইচ্ছা জেগেছে মনে। সেই অনুমতিই আমার দীক্ষাগুরু এই হুজুরের কাছে নিতে এসেছি।

: আচ্ছা!

: আরজ পেশ করেছি, কিন্তু অনুমতি এখনো পাইনি।

সুফী প্রধান শেখ তওফিক সাহেব এবার বললেন– অনুমতি দিলাম। তবে বেড়ানোর খাতিরেই শুধু ঘুরে বেড়ানো নয়। কিছু কাজ নিয়ে আপনি ঘুরে বেড়ান– এই আমার ইচ্ছা।

আমি বললাম– কাজ? কাজ কোথায় পাবো হুজুর?

হুজুর বললেন– আমি দিচ্ছি। এই রাজা বাহাদুর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাচ্ছেন। সেনা বাহিনী ছাড়া সাথে তাঁর কোন শুভাকাঙ্ক্ষী থাকছেন না। আপনি যে এই জনাব শাহ সুলতানের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী তা আপনার মুখেই শুনেছি। আপনি এই জনাবের সাথে বাংলাদেশে গমন করুন। তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে আর উপদেষ্টা হিসেবে জনাবের সাথে সাথে থাকবেন। তাঁর দেখ-ভাল করবেন। কোথাও কোন ভুল করতে থাকলে তা সংশোধন করবেন। অধিক করতে থাকলে তাঁকে নিরস্ত করবেন– এই আপনার কাজ। রাজি?

Boighar.BABD
এমন একজন প্রাণবন্ত আর সৎমানুষের সাথে বিদেশ যাওয়ার মওকা পেয়ে আমি সোল্লাসে বললাম– রাজি হুজুর, এক কথায় রাজি।

হুজুর এবার শাহজাদা শাহ সুলতানকে বললেন– কি জনাব, আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

শাহজাদা উল্লাস ভরে বলে উঠলেন– কিছুমাত্র না হুজুর! বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এই পীর সাহেব আমার প্রতিবেশী আর আমার পছন্দের লোক। এমন লোককে সঙ্গে পাওয়া আমার এক খোশ কিসমতি হুজুর। উনাকে সঙ্গে পেলে আমি ধন্য হবো।

সুফী প্রধান বললেন– তাহলে যান আপনারা। কালক্ষয় না করে অবিলম্বে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে যান। এরপর তিনি শাহজাদাকে বললেন– জনাব আগে গিয়ে জনাবের রাজধানী থেকে একটা ছোট আর চৌকস সৈন্যদল যোগাড় করে নিন। তারপর এই আলহাজ খলিল পীরসহ আল্লাহর নাম নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ুন।

হুজুরের খানকা থেকে বেরিয়ে আমরা দু'জন একসাথে শাহজাদার অর্থাৎ এক্ষণে এই রাজার রাজপ্রাসাদে গেলাম। রাজা তাঁর বলখ রাজ্যের ভার উজির শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের উপর দিয়েছেন, তা শুনেছিলাম। রাজ প্রাসাদে গিয়ে শাহ সুলতান উজির সাহেবকে বললেন– চাচাজান! সুফী শ্রেষ্ঠ শেখ তওফিক সাহেব আমাকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাওয়ার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তাই আমার একটা সৈন্যদল দরকার। আমাকে একটা সৈন্যদল যোগাড় করে দিন।

উজির সাহেব বললেন– সৈন্যদল?

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– জি, চাচা। বিদেশ বিভূঁইয়ে ইসলাম প্রচারে গিয়ে বিপদ মুসিবতে পড়তে পারি তো? তাই একটা সৈন্যদল সঙ্গে নিতে চাই।

: ঠিকই তো, ঠিকই তো। তা পড়াই তো স্বাভাবিক। তা কত বড় সৈন্যদল চাই বাপজান? বিশাল কোন সৈন্যবাহিনী কি?

: না চাচাজান, বিশাল বাহিনী নয়। আমি তো আর রাজ্য জয়ে যাবো না, যাবো ইসলাম প্রচারে। তাই আত্মরক্ষার জন্যে একটা ছোট সৈন্যদল সাথে নিতে চাই। তবে দলটি চৌকস দল হওয়া চাই। আপনি দয়া করে এমনই একটি দল গঠন করে দিন।

উজির সাহেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন– গঠন করতে হবে না বাপজান। আমাদের সেনা ছাউনিতে এমন একটি ছোট অথচ চৌকস বাহিনী আগে থেকেই আছে।

: আছে?

Boighar & BABD

: জি বাপজান! তরুণ ফৌজদার নূর মুহম্মদের অধীনে এমনই একটি বাহিনী আগে থেকেই আছে। চৌকস বাহিনী। ফৌজদার নূর মুহম্মদ বাছাই বাছাই সৈন্য নিয়ে এমন একটি ছোট্ট অথচ চৌকস সৈন্যদল আগে থেকেই গঠন করে রেখেছেন। নূর মুহম্মদ নিজে যেমন একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক, তার অধীনের দলটিও তেমনি চৌকস। লড়াইয়ে শত্রুপক্ষকে দ্রুত আঘাত করা দল।[১]

: সাব্বাস!

: এর উপর ফৌজদার নূর মুহম্মদ একজন ইমানদার ও বিশ্বস্ত নওজোয়ান। ও সাথে থাকলে বাপজানের খুবই ভাল হবে।

: মা'শা আল্লাহ! তাহলে ঐ দলটিই আমাকে আনিয়ে দিন। পরে অন্য কোন দুর্ধর্ষ সৈনিককে দিয়ে লড়াইয়ের জন্যে যদি লড়াই বাঁধে ঐ রকম একটা দল আপনারা তৈরি করে নেবেন। এটা আমাকে দিন চাচাজান।

: ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার এই সঙ্গী, মানে এই বাপজানসহ আগে বিশ্রামখানায় গিয়ে আহার বিশ্রাম সেরে নিন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই বাপজান বলতে উজির সাহেব আমার প্রতি ইংগিত করলেন।

০ ০ ০

ব্যবসায়ী শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের মালবাহী জাহাজের প্রশস্ত কামরায় বসে শাহজাদা শাহ সুলতানের কাহিনী বলে যাচ্ছেন হাজী খলিল পীর আর তাঁর একাগ্র শ্রোতা গুরুদাস। সুরমা রানীর বাড়ির পাশের গুরুদাস। হাজী খলিল পীর এরপর বললেন– ফৌজদার নূর মুহম্মদের বাহিনী নিয়ে আবার আমরা বের হলাম বাংলাদেশের উদ্দেশে। আরবের জাহাজ ঘাটে এসে শাহজাদা মাছের আকৃতি বিশিষ্ট মস্তবড় এক জাহাজ পছন্দ করে নিলেন এবং আমাকে আর ফৌজদার নূর মুহম্মদের বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সেই জাহাজে উঠে পড়লেন। এরপর ছেড়ে দিলো জাহাজ আর আমরা ছুটে চললাম বাংলাদেশের দিকে। মাছের আকৃতি বিশিষ্ট জাহাজে চড়ে শাহজাদা বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে অনেকে তাঁর নাম দিলেন, 'মাহি আছোয়ার'– অর্থাৎ মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে আসা লোক।

www.boighar.com

Boighar.BABD
গুরুদাস আবার প্রশ্ন করলো– তারপর কি করলেন হুজুর? সবাই চুপচাপ বসে রইলেন?

পীর সাহেব বললেন– হ্যাঁ, বসে থাকাই তো। সৈন্য নিয়ে নূর মুহম্মদ সাহেব অন্যদিকে একটা মস্ত বড় কামরায় গিয়ে কি করলেন, তা বলতে পারবো না। তবে শাহজাদা আমাকে নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর আর সাজানো গুছানো একটা ছোট কামরায় উঠলেন। আমি মোটামুটি চুপচাপই রইলাম। কিন্তু শাহজাদা সব সময় চুপচাপ ছিলেন না। উনি শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝেই গুন গুন করে আধ্যাত্মিক গান গাইতে থাকেন।

: কি গান হুজুর, কি আধ্যাত্মিক গান?

: অনেক গানই গান তিনি। তবে তুমি ঐ যে বলেছিলে– 'রাসূল নামের ফুল এনেছিরে, আয় গাঁথবি মালা কে?' ঐ গানটি বার বার গাইতেন।

: আচ্ছা! তাহলে ঐ গানটি আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে হুজুর?

পীর সাহেব হাসিমুখে বললেন– শুধু গানটিই নয়, ঐ গানের সুরটিও আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, গুরুদাস।

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে গুরুদাস বললো– বলেন কি হুজুর, তাই?

: হ্যাঁ, তাই।

: গেয়ে শুনাতে পারেন?

: অবশ্যই পারি। –বলেই তিনি ভয়ানক শব্দ করে গেয়ে উঠলেন–

'রসূল নামের ফুল এনেছিরে–

আয়, গাঁথবি মালা কে?

ঐ মালা পরেই রাখবি বেঁধে...'

–বলতেই পীর সাহেব জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আগে থেকেই তাঁর শরীর দুর্বল ছিল। অতি উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর দম বন্ধ হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে তিনি বিছানায় ঢলে পড়লেন।

তা দেখে চমকে উঠলো গুরুদাস। পীর সাহেবকে ধরে, 'বাঁচাও বাঁচাও, মারা গেলেন হুজুর! মারা গেলেন, বাঁচাও, বাঁচাও!' –বলে চিৎকার করতে লাগলো গুরুদাস।

জাহাজের মালিক এবং হাজী খলিল পীরের ভক্ত শেখ আবদুল আজিজ সাহেব এই সময় এই কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চিৎকার শুনে তিনি ছুটে এলেন পীর সাহেবের কামরায়। ঘটনা শুনে আর পীর সাহেবের অবস্থা দেখে শেখ

আবদুল আজিজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তলব দিলেন জাহাজের চাকর নফর আর কর্মচারীদের। সবাই মিলে পীর সাহেবের শুশ্রূষায় নিয়োজিত হলেন। অনেকক্ষণ যাবত শুশ্রুষার ফলে জ্ঞান ফিরলো পীর সাহেবের। তিনি চোখ মেলে তাকালেন এবং একটু পর উঠে বসলেন বিছানায়।

এরপর ঘটনা শুনে শেখ আবদুল আজিজ সাহেব পীর সাহেবকে সকল গান গীত ও গল্পালাপ বন্ধ করে পুরো এক মাসের বিশ্রাম নেয়ার উপদেশ দিয়ে গেলেন। শুধু উপদেশ দেয়াই নয়, পুরো এক মাস নীরব থাকতে রীতিমতো চাপ দিয়ে গেলেন। নীরব থাকার প্রয়োজনটা পীর সাহেব নিজেও অনুভব করলেন। তাই হাজী খলিল পীর সাহেব বন্ধ করলেন কথা বলা। অতি প্রয়োজনীয় দু'চারটে কথাবার্তা ছাড়া সকল কথাবার্তা বন্ধ করলেন তিনি।

বন্ধ হয়ে গেল শাহজাদা শাহ সুলতানের কাহিনী বর্ণনা করা।

৬

এদিকে সুরতান সাহেব (শাহ সুলতান) ব্রাহ্মণকন্যা সুরমা রানীকে শাদি করে শ্বশুরের পয়সায় পৃথক অন্নে ও পৃথক বাসায় বেশ আরামেই কালাতিপাত করছিলেন। শাদির সময় সুরমা রানী মুসলমান হয়ে নাম দিলেন সুরমা বিবি। এতে করে ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার সঙ্গে এক অন্নে থাকা তাঁর সম্ভব হলো না। মুসলমান স্বামী সুরতান সাহেবকে নিয়ে পৃথক বাড়িতে পার হলেন তিনি এবং পৃথক হাঁড়ি খুললেন।

সুরমা বিবি তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। পিতা-মাতার অভাবে পিতা-মাতার বাড়িঘর ও বিপুল বিষয়বিত্ত সব সুরমারই হবে হেতু, সুরমার পিতা-মাতা মেয়ে জামাইয়ের যাবতীয় খরচ তাঁদের অঢেল সম্পত্তি থেকে চালাতে লাগলেন। অর্থের কোন অভাব মেয়ে জামাইয়ের রইলো না বা জামাই সুরতান সাহেবকে উপার্জনের কোন ধান্দা করতে হলো না। শুয়ে বসে আরামেই দিন কাটতে লাগলো তাঁর।

এছাড়া সংসারের কাজের জন্যে পৃথক কোন চাকর-বাকরও রাখতে হলো না মেয়ে জামাইকে। সুরমার বাপের সংসারে অনেক দাসদাসী। তারাই এসে করে দিতো মেয়ে জামাইয়ের সাংসারিক কাজকর্ম। খেটে দিতো ফাই-ফরমায়েশ।

সেদিন কি এক কাজের জন্যে জামাই সুরতান সাহেবের বাজারে লোক পাঠানোর জরুরী দরকার পড়লো। অনেকক্ষণ যাবত তিনি শ্বশুরের চাকর-বাকরদের ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু কেউ না আসায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর হরিদাস এসে সামনে দাঁড়ালে সুরতান সাহেব শ্লেষভরে বললেন– এই যে জমিদার তনয়েরা! এতক্ষণ ছিলে কোথায়? এই দিনের বেলাতেও আরামে ঘুমোচ্ছিলে?

হরিদাস হোঁচট খেলো। সুরতান সাহেবের নিকট থেকে এমন সম্বোধন হরিদাস কখনো আশা করেনি। সে ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো– কি যে বলেন কত্তা? দিনের বেলায় আরামে ঘুমানোর কপাল কি আমাদের?

: তাহলে কোথায় ছিলে তুমি হুজুর? কোন ভাংগা ঘর তুলছিলে? এদিকে তো একবারও এলে না?

: তা কথা হলো...

Boighar & BABD

: না ঘুমালেও, বেশ শুয়ে বসে রাজার হালেই দিন কাটছে, না কি বলো?

হরিদাসের মনেও রাগ হলো। সে এবার বেশ ঠেশ দিয়েই বললো– শুয়ে বসে তো দিন কাটছে আপনার কত্তা! শ্বশুরের পয়সা দুই হাতে উড়াচ্ছেন আর শুয়ে বসে থাকছেন। পরের বাড়িতে খাটতে তো হয় না!

হরিদাসের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে সুরতান সাহেব বললেন– হরিদাস!!

হরিদাস বললো– নিজে উপায় না করে, পরের পয়সায় বসে বসে খাওয়া সব মানুষের কপালে জুটে না কত্তা। সব মানুষ তাতে আনন্দও পায় না। রুচিতে বাধে।

এবার সুরতান সাহেব সক্রোধে বললেন– তার অর্থ? কি বলতে চাও তুমি?

মাথা নিচু করে হরিদাস বললো– থাক কত্তা। কি জন্যে ডেকেছিলেন সেটা বলুন? সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারিনি, অপরাধ ক্ষমা করবেন।

সুরতান সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– যে জন্যে ডেকে ছিলাম, সেটার আর দরকার নেই। তুমি যাও...

: কত্তা!

: ঢের আক্কেল দিয়েছো হরিদাস। আর জ্বালাইও না। যাও...

: তা মানে!

: আহ! তুমি যাও দেখি...!

অগত্যা চলে গেল হরিদাস। হরিদাসের বক্তব্য, তার ইংগিত সুরতান সাহেবের আত্মসম্মানে জব্বোর আঘাত করলো। টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি।

অসময়ে স্বামীকে শুয়ে থাকতে দেখে সুরমা বিবি এসে শংকিতকণ্ঠে বললেন– কি গো, অসময়ে শুয়ে আছেন যে? কোন অসুখ-বিসুখ করলো নাকি?

সুরতান সাহেব সংক্ষেপে জবাব দিলেন– না, কোন অসুখ-বিসুখ করেনি।

: তাহলে অসময়ে শুয়ে আছেন কেন?

: এমনি।

: এমনি মানে? আমার উপর তাহলে বুঝি রাগ হয়েছে জনাবের?

: রাগ! তোমার উপর রাগ হবে কেন?

: তা না হলে শুয়ে থাকার কারণটা তো বলছেন না! সারারাত একটানা ঘুমালেন, এখন তো ঘুম ধরার কথা নয়?

: না, ঘুম ধরেনি।

Boighar & BABD

: তাজ্জব! ঘুমও ধরেনি? তাহলে ঘটনা কি বলুন না গো?

: ঘটনা মানে, আমি ভাবছি...!

: ভাবছেন? কি ভাবছেন?

: জোয়ান মানুষ আমি। কোন আয় উপায় না করে এভাবে শ্বশুরের পয়সায় বেঁচে থাকা কোন পুরুষোচিত কাজ নয়।

বুঝতে পারলেন না সুরমা বিবি। বললেন– কি বললেন? শ্বশুরের পয়সায় বেঁচে থাকা না, কি?

সুরতান সাহেব বললেন– হ্যাঁ, তাই বৈ কি? আয় উপায়ের কোন ধান্দা না করে এভাবে বসে বসে শ্বশুরের পয়সা খাওয়াটা সকলের রুচিতেই বাধার কথা।

: সে কি, সে কি! এ আপনি কি বলছেন?

: দেখলাম একজন কামিন মজুরের রুচিতেও এটা বাধে। বাধে না শুধু আমার রুচিতে।

: তার মানে?

: অবশ্যই আমার উপার্জন করা উচিত।

: হায় আল্লাহ! একি সর্বনেশে কথা! আমার বাপের সমস্ত পয়সার আমরাই মালিক। আমরা ছাড়া এত পয়সা খাওয়ার কেউ নেই। আমার পিতা-মাতার অভাবে সমস্ত পয়সা আমরাই পাবো। আপনি উপার্জন করবেন মানে?

: তাঁদের অভাবে লক্ষ-কোটি পেলেও, এক্ষণে তাঁদের পয়সায় জীবন ধারণ কাপুরুষের লক্ষণ!

: দোহাই আপনার! এমন অহেতুক চিন্তা-ভাবনা করবেন না।

: কেন করবো না? এক্ষণে তো একটা কপর্দকও হাতে নেই আমার। তাঁদের তোলা পয়সা খাচ্ছি। তাঁদের পয়সা হাত পেতে নিয়ে আরামে দিন কাটাচ্ছি। না না, এ হতে পারে না। কখ্খনো না। আমি উপার্জনে নামবো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হলেও নিজের উপার্জনের পয়সা দিয়ে সংসার চালাবো।

: আপনার পায়ে পড়ি। আমার মাথার দিব্যি। এমন কথা বলবেন না।

: সুরমা!

: আমার বাপের পয়সা মানেই আমার পয়সা। আমার এত পয়সা থাকতে আপনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করবেন, সেই পয়সায় সংসার চালাবেন, এরপরও বেঁচে থাকা চলে আমার?

: চলে না?

Boighar & BABD

: না, কখ্খনো চলে না।

: সুরমা!

: আমি ভেবে পাচ্ছিনে, আজ হঠাৎ এমন চিন্তা আপনার মনে এলো কি করে?

: আজ নওকর, মানে খেটে খাওয়া মানুষ হরিদাস আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো বলে।

: হরিদাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, কী রকম?

: পরের পয়সায় বসে বসে খাওয়া হরিদাসও পছন্দ করে না। ফাঁকে ফুরসুতে একটু আধটু বাঁশি বাজাতো ঠিকই, কিন্তু সে খেটে খায়। এসব কথা সে মুখের উপর শুনিয়ে দিলো।

: পরের পয়সা কি রকম? এটা আপনার শ্বশুরের পয়সা।

: বাপের পয়সা হলেও কোন কাজকর্ম না করে সেরেফ শুয়ে বসে খাওয়া ঠিক নয়– এটা সে তার কথাতেই বুঝিয়ে দিলো।

ক্রোধে জ্বলে উঠলো সুরমা বিবি। বললেন– কি! এত বড় স্পর্ধা ঐ হরিদাসের! আমি ওকে খুন করবো!

সাপের মতো ফুঁসতে লাগলেন সুরমা বিবি। সুরতান সাহেব বললেন– তাহলে আমাকেও এ গৃহ ত্যাগ করতে হবে। কারণ, হরিদাস কোন অন্যায্য কথা বলেনি। ঠিক কথাটাই বলেছে।

ঘাবড়ে গেলেন সুরমা বিবি। রাগ বন্ধ করে ভীতকণ্ঠে বললেন– জনাব!

: ওর উপর রাগ দেখালে, আমার পথ দেখতেই হবে আমাকে। কোন বিকল্প নেই।

: ঠিক আছে, রাগ দেখাবো না। আপনিও এ গৃহ ত্যাগ করার কথা বারেক বলবেন না, বলুন?

সুরতান সাহেব জবাব দেয়ার আগেই বাড়ির কাজের ঝি এসে ডাক দিয়ে বললো – ওমা, সে কি গো! পাক শাক শেষ করে সেই কখন ঘাটে গিয়েছি আমি, তবু আপনারা ঘর থেকে বেরোন নি? কখন ডুব্খাপ্ দেবেন আর কখন খেতে আসবেন? এদিকে যে ভাত তরকারী সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

সুরমা বিবি চমকে উঠে বললেন– এ্যাঁ! তাই নাকি? সত্যিই তো অনেক দেরী হয়ে গেছে! –বলেই সুরতান সাহেবকে বললেন– উঠুন জনাব, উঠুন। গোসলের পানি দেয়া আছে, শিগ্গির উঠে গোসলখানায় যান। উঠুন, উঠুন।

সুরমা বিবির উপর্যুপরি তাকিদে সুরতান সাহেব উঠে গোসলখানায় ঢুকলেন।

০ ০ ০

পরের দিন সকালে সুরমা বিবিকে কিছু না জানিয়ে উপার্জনের সন্ধানে পথে নামলেন সুরতান সাহেব। পথে ডালি কোদাল কাঁধে একদল মজুরের সাথে তাঁর দেখা। কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে তিনি তাদেরকেই বললেন– এই যে দাদারা! আমাকে একটা পথ বলে দিতে পারেন?

মজুর দলের সর্দার সুরতান সাহেবকে দেখেই বলে উঠলো– আরে কে? লাল টুকটুকে কার্তিক ঠাকুর, কে আপনি? ও পাড়ার মুসলমান হওয়া সুরমা রানীর বর নাকি?

সুরতান সাহেব বললেন– জি দাদা, তাই!

: আচ্ছা! তা কিসের পথ খুঁজছেন?

: আয়-উপার্জনের পথ দাদা। কিভাবে উপার্জন করতে পারি, তা কি বলে দিতে পারেন?

তাঁর মতো লোক এমন প্রশ্ন করায় মজুর দলের সর্দার কিছুটা রসিকতা করেই বললো– উপার্জনের পথ? হ্যাঁ পারি। উপার্জনের সহজ পথ হলো চুরি। মোটা উপার্জন করার পথ ডাকাতি। চুরি-ডাকাতি করতে পারলে ভাল উপার্জন করা যায়।

সুরতান সাহেব শরম পেয়ে বললেন– ছিঃ ছিঃ! কি যে বলেন দাদা? চুরি-ডাকাতি কি উপার্জনের কোন সৎপথ? সৎপথে কিভাবে আয় উপার্জন করতে পারি, পারলে সে কথাটা বলুন দাদা।

: সৎপথে আয় উপায়ের একটা মাত্র পথ ছাড়া আর কোন পথ আমাদের জানা নেই।

: কি পথ দাদা?

: আমরা যেভাবে উপার্জন করি, সেই পথ। মানে মজুর খাটা।

: মজুর খাটা? ওভি আচ্ছা! তা কোথায় মজুর খাটবো, সে সন্ধান কি দিতে পারেন?

: পারি। কিন্তু আপনি মজুর খাটবেন? আপনার মানহানি হবে না?

: কিসের মানহানি দাদা? সৎপথে যে উপায় করে তার মান কমে না; বরং বাড়ে।

: সাব্বাস! তাহলে চলে আসুন আমাদের সাথে। আমরা যেখানে কাজ করছি, সেখানে লেগে যান কাজে।

: কোথায় দাদা?

: এই পাড়ার উত্তর দিকের শেষ বাড়িটা বলরাম পালের বাড়ি। পয়সাওয়ালা লোক। উনি পুকুর কাটছেন বাড়ির সামনে। আমরা সেই পুকুর খুঁড়ছি। এই ডালি কোদাল নিয়ে সেখানে যাচ্ছি। চলে আসুন আমাদের সাথে।

: কিন্তু আমার সাথে তো কোন ডালি কোদাল নেই!

: তাতে কি! আমরা মাটি কেটে ডালি ভরবো, আপনি সেই ডালি মাথায় করে নিয়ে গিয়ে ডালির মাটি পুকুরের পাড়ে ফেলবেন। পারবেন তো?

: খুব পারবো। না পারার কি আছে!

: আপনার বিবি, মানে ঐ সুরমা রানী, আপনাকে এই রকমভাবে মজুর খাটতে দেখলে রাগ করবে নাতো?

: করুক! রাগ দিয়ে তো পেট ভরবে না। পেট ভরাতে হলে পয়সা চাই।

: ঠিকই তো। ঠিক বলেছেন।

: ঐ পাল মশায় মজুর প্রতি প্রতিদিন কত দেয় দাদা?

: খোরাক নিয়ে দিনমান কাজ করলে আধা পয়সা আর আব-খোরাকী কাজ করলে পুরো এক পয়সা।

: বাহ! খুব ভাল তো!

www.boighar.com

: ভাল মানে কি? আপনি তো আর আমাদের খাবার খাবেন না। আপনি আব-খোরাকী কাজ করবেন। আপনি প্রতিদিন পুরো এক পয়সা পাবেন। দু'জনের দেড় দিনের ভাতের চাল বাদেও একটা লাল টুকটুকে রুই মাছ কিনতে পারবেন কামাই দিয়ে।

: তাই নাকি? বিরাট সুযোগ তো? বড় চমৎকার উপায়!

: তো আর বলছি কি? যদি ঐ উপায় করতে চান, আমাদের সাথে আসুন...

: জি জি, চলুন দাদা, চলুন...।

কাজে এসে সরাসরি মাটি বইতে লাগিয়ে দিলো মজুর সরদার। মজুরের খাতায় সুরতান সাহেবের নাম তুলে দিয়ে মাটির ডালি তুলে দিলেন সুরতান সাহেবের মাথায়। হিন্দুদের সুদর্শন দেবতা কার্তিক ঠাকুরের মতো অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী, সুরতান সাহেবের মাথায় মাটির ডালি দেখে অবাক হলো কর্মরত মজুরেরা। কাজ ফেলে সেদিকে চেয়ে থাকার কারণে সরদারের পুনঃ পুনঃ ধমক খেতে লাগলো।

Boighar & BABD

এদিকে তীব্র রোদে কিছুক্ষণ মাটি টানতেই ঝলসে গেল সুরতান সাহেবের চেহারা। ময়লা মাটি লেগে সোনার বরণ চেহারা তার মলিন হয়ে গেল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দম নেয়ার জন্যে পুকুরের পাড়ে এসে হেথা হোথা বসে সবাই পান পানি খায়। সেদিনও তাই বসলো এবং লোটা থেকে পানি খেয়ে পান খেতে লাগলো। ঘটনাচক্রে সুরতান সাহেব এসে বসলেন এক গাঁজিলের পাশে। গাঁজিলটি তখন পুরো মাতাল। হাপুর হুপুর গাঁজার কলকেয় টান দিচ্ছে আর জড়িতকণ্ঠে গাইছে–

'বাংলাদেশের গাঁজা বাবা বাংলাদেশের গাঁজা।
এক ছিলুমে যেমন তেমন, দুই ছিলুমে মজা
তিন ছিলুমে উজির-নাজির, চার ছিলুমে রাজা,
বাবা বাংলাদেশের গাঁজা।
হা-হা বাংলাদেশের গাঁজা।'

গান থামিয়ে গাঁজিলটি ঘুরে বসলো সুরতান সাহেবের দিকে। সুরতান সাহেবের চেহারা দেখে সেও অবাক হলো। জড়িতকণ্ঠে ডাকতে লাগলো– আরে ও ঠাকুর, ও বাবা লাল চাঁদ...

সুরতান সাহেব বললেন– আমার নাম লাল চাঁদ নয়। লাল চাঁদ বলছো কেন?

গাঁজিলটি জোরকণ্ঠে বললো– বলবো না? এমন লাল টুকটুকে যার চেহারা, তাকে লাল চাঁদ বলবো না তো কি কালা চাঁদ বলবো? বলো বাবা, সেটা বলা কি ঠিক?

পাগলের কথা গায়ে না মেখে সুরতান সাহেব বললেন– বলো, তোমার যা খুশি বলো। বাঘ তো নও, তুমি বিড়াল। তোমার প্যান পেনানী গায়ে মাখবো কেন?

তড়াক্ করে মাথা তুলে গাঁজিল এবার বললো– তুমি বাঘ দেখেছো? বাঘ?

: বাঘ!

: হ্যাঁ, বাঘ। আমি বাঘ দেখেছি!

: কোথায়?

: ঐ হাটে।

: হাটে! হাটে বাঘ দেখলে?

: আলবত দেখলাম! আজই দেখলাম।

: পাগল!

: পাগল নয়, পাগল নয়–

Boighar & BABD

'হাটের কাদায় বাপরে বাপ্
আস্ত বাঘের পায়ের ছাপ
দেখলে সবাই ফুটিয়ে চোখ
বাঘের পায়ের পাঁচটি নোখ!'

–পাগল মানে? সত্যি কথা বলছি।

সুরতান সাহেব বললেন– তাতে তোমার কি? তুমি বাঘ দেখলে কি করে!

গাঁজিল এবার প্রত্যয়ের সাথে বললো–

'হাটে গেল হবা'র মাও
দেখে এলো বাঘের পাও,
তাঁই ক'লো মুই শুন্‌নু
মরি বাঁচি বাঘ দেখনু–'

–হুঁ হুঁ, বাবা, মিথ্যা আমি বলি না!

: সাব্বাস!

পরক্ষণেই সুরতান সাহেব বললেন– উঁঃ! কি দুর্গন্ধ! ওটা তুমি কি টানছো?

জবাবে গাঁজিল বললো– ছোট কলকে বাবা। মানে সিদ্ধি, সিদ্ধি।

: সিদ্ধি কি?

: তাও জানো না? গঞ্জিকা বাবা, গাঁজা! বলেই গান ধরলো–

বাবা বাংলাদেশের গাঁজা,
এক ছিলুমে যেমন তেমন, দুই ছিলুমে মজা,
তিন ছিলুমে উজির-নাজির, চার ছিলুমে রাজা।'

এমনি কি টানছি! এটা দাওয়াই বাবা, দাওয়াই। ওষুধ!

সুরতান সাহেব বললেন– ওষুধ! কিসের ওষুধ?

গাঁজিল বললো– বল বৃদ্ধিকারক ওষুধ বাবা। এতে তাকত বাড়ে। কুওৎ বাড়ে।

: তাই নাকি?

: আলবত! এই মাটি কাটা কাজ শক্তির কাজ। তাকতের কাজ। এতে একটা দম দাও, ব্যস! তুমি নিশ্চিত। তোমার তাকত এমন বাড়া বেড়ে যাবে যে, তুমি মাটি টানছো, এটা বুঝতেই পারবে না। কোন দিক দিয়ে তোমার সারাদিন মাটি টানা হয়ে যাবে, টেরই পাবে না।

: বলো কি?

: দেখো বাবা, দেখো। জোরে একটা টান দিয়ে দেখো, আমার কথা ঠিক কি না।

: ঠিক বলেছো?

: ঠিক ঠিক, একদম ঠিক। এই যে ধরে আছি, এখানে মুখ লাগিয়ে মারো জোরে এক টান।

সুরতান সাহেব মনে মনে বললেন– মারবো টান? পরীক্ষা করে দেখবো একবার? সত্যিই শরীরের শক্তি আমার ইতিমধ্যে খুবই কমে গেছে। টান দিয়ে দেখি না, যদি শক্তি বাড়ে! এ লোক এত টানছে তবু কিছু হচ্ছে না, আমার কি হবে? দেখি টান দিয়ে...

–বলেই গাঁজিলের দেখানো জায়গায় মুখ লাগিয়ে তিনি এমন জোরে একটা টান মারলেন যে, আগুন জ্বলে উঠলো কলকের মাথায় আর সরসর করে এক রাশ ধোঁয়া ঢুকে গেলো সুরতান সাহেবের পেটে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে পাক দিয়ে উঠলো তাঁর বত্রিশ নাড়ি, ঘুরে গেল মাথা। গল গল করে বমি করে শাটপাট মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন উপার্জনের ধান্দায় আসা সুরমার বর সুরতান সাহেব।

০ ০ ০

এদিকে সুরমা বিবি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। সকাল বেলা কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন সুরতান সাহেব। বেলা দুপুর গড়ে গেল তবু তিনি ফিরলেন না। এতে করে অস্থির হয়ে উঠলোন সুরমা বিবি। স্থির থাকতে না পেরে হরিদাসকে ডেকে তাকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন সুরতান সাহবের খোঁজে।

খুঁজতে নেমে হরিদাস জানতে পারলো, মজুরদের সাথে সুরতান সাহেব বলরাম পালের পুকুর খুঁড়তে গেছেন। সেই মোতাবেক বলরাম পালের পুকুর পাড়ে এসে হরিদাস পুকুরের পাড় বেয়ে হাঁটতে লাগলো আর সুরতান সাহেবকে খুঁজতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে সুরতান সাহেব যেখানে পড়েছিলেন সেই স্থানের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। সেখানে একজন লোককে মাটির ডালি মাথায় করে পুকুরের পাড়ে উঠে আসতে দেখে হরিদাস তাকে বললো– এই যে দাদা, একজন অত্যন্ত দর্শনধারী লোক, এখানে নাকি মাটি কাটা কাজ করতে এসেছেন। তিনি কোথায়, বলতে পারেন?

Boighar & BABD
ডালির মাটি পাড়ে ফেলে লোকটি বললো– কে? লাল টুকটুকে কার্তিক ঠাকুরের মতো দেখতে, সেই লোকটা?

: আজ্ঞে দাদা, আজ্ঞে, আজ্ঞে।

: আর একটু সামনে এগিয়ে যাও, দেখবে মাটিতে পড়ে ঘুমাচ্ছে। বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

: ঘুমাচ্ছেন?

: ঘুমাবেই তো। ঐ রকম একটা নাদুস নুদুস সুদর্শন ভদ্দর লোক, এই মাটি টানা কাজ কি বেশিক্ষণ করতে পারে? খানিকক্ষণ টেনেই ক্লান্ত হয়ে পাড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে।

: কোথায় দাদা? এই সামনে?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখো, একটা গাঁজাটানা মাতালের পাশে পড়ে থেকে ঘুমুচ্ছে। গাঁজিলটাও কাজ ফেলে উঠে এসে বেসুমার গাঁজা টেনে ঐভাবে পড়ে আছে। যত্তসব!

পাড় থেকে লোকটা ফের ডালি হাতে নিচে নেমে গেল। হরিদাস আর একটু সামনে এগিয়ে এসে দেখলো, হ্যাঁ, ঘটনা ঠিক। সুরতান সাহেবই পড়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ সুরতান সাহেবকে ধরে তুলতে তুলতে হরিদাস বললো– হায় হায়! একি কত্তা? এ কি? এখানে ঘুমাচ্ছেন কেন?

জবাব দিলো গাঁজাটানা মাতালটা। জড়িতকণ্ঠে বললো– ঘুমোচ্ছে না বাবা। গাঁজার কলকের একটা টান দিয়েই কুপোকাত! গল গল করে বমি করে ওখানে পড়ে ধুঁকছে। ঘুমোয়নি, ঘুমোয়নি!

সুরতান সাহেবকে তুলতে গিয়ে হরিদাস দেখলো, ঘটনা সত্য। বমন করে সুরতান সাহেব মুখ, বুক আর জামা-কাপড় মাখিয়ে ফেলেছেন আর মৃদু মৃদু ধুঁকছেন। দেখেই হরিদাস বলে উঠলো– রাম রাম! চোখ মুখ বুক আর কাপড় চোপড়ের একি দশা! ছিঃ ছিঃ? জলের দরকার– জল পাই কোথায়? বলেই গাঁজিলটাকে বললো– এই দাদা, এখানে জল কোথায় পাবো? জলের যে বড়ই দরকার!

গাঁজিলটা বললো– ঐ তো বাবা! তোমার আগে পাশেই কত জলের লোটা! দেখতে পাচ্ছো না, এ্যাঁহ্? মজুরেরা জল খেয়ে রেখে দিয়েছে বাবা! ওখানে জল থাকতেও পারে দেখো! ব্যোম ভোলা!

গাঁজিল আবার নিভে যাওয়া কলকেয় মুখ লাগালো। হরিদাস লক্ষ্য করে দেখলো, হ্যাঁ, এখানে সেখানে অনেকগুলো লোক পড়ে আছে। দৌড় দিয়ে উঠে

Boighar & BABD

গিয়ে যে লোটাতে জল বেশি, সেই লোটা নিয়ে এলো হরিদাস। এরপর আগে সুরতান সাহেবের চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়ে পরে মুখ বুক ধুয়ে দিতেই জ্ঞান ফিরলো সুরতান সাহেবের। তিনি তখন পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত।

হরিদাস তাকে তুলে বসালে সুরতান সাহেব জড়িতকণ্ঠে বললেন– কে? কে তুমি বাবা?

হরিদাস বললো– আমি হরিদাস কত্তা। হরিদাস।

সুরতান সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– হরিদাস! কোন হরিদাস?

: চিনতে পারলেন না কত্তা? আমি আপনার শ্বশুর বাড়ির চাকর, মানে, আপনাদের হরিদাস।

: আমাদের হরিদাস! ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। চিনতে পেরেছি বাওয়া! তুমি হরিবাঁশ, আমাদের হরিবাঁশ।

: হরিবাঁশ মানে?

: মানে দাঁশীওয়ালা হরিবাঁশ। বুঝতে পারো না বাবা?

: দাঁশীওয়ালা হরিবাঁশ নয় কত্তা, বাঁশিওয়ালা হরিদাস।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, হরিদাস, বাঁশীওয়ালা হরিদাস, একটু বাজাও তো বাবা! তোমার বাঁশিটা একটু বাজাও তো শুনি?

: বাঁশি নেই কত্তা। ফেলে দিয়েছি।

: কেন কেন?

: বাঁশি বাজানো আমি ছেড়ে দিয়েছি।

: যা ব্বাবা! ও কম্মটি আবার করলে কবে বাবা?

: ঐ যে যেদিন আপনি পূজো নেয়ার ভয়ে পালিয়ে গেলেন, আর আপনাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, সেই দিন।

: খুঁজে পাওয়া গেল না?

: কি করে যাবে কত্তা? পালিয়ে ভিন এলাকায় গিয়ে কোন বন-জঙ্গলে লুকালেন, পাওয়া যাবে কি করে?

: বন-জঙ্গলে লুকালাম?

: হ্যাঁ, বন-জঙ্গলেই তো। আপনাকে যে বাঘে খায়নি, সেই ঢের।

: বাঘ?

Boighar & BABD

: হ্যাঁ। বাঘ ভালুক তো বন-জঙ্গলেই থাকে। শুনেছি, পালিয়ে গিয়ে ভিন্ন এলাকায় যে বনের ধারে পড়েছিলেন, সেই বনে নাকি বাঘ থাকে। অনেক লোক তো দেখেছে।

: অনেক লোক বাঘ দেখেছে? সে কি বাবা!

: আজ্ঞে, দেখেছে।

: তুমি বাঘ দেখেছো?

: আজ্ঞে না কত্তা। আমি কখনো বাঘ দেখিনি।

: আমি বাঘ দেখেছি।

: দেখেছেন?

: দেখেছি বাবা। জাজ্বিল্যমান দেখেছি।

: দেখবেনই তো। যেভাবে বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন আগে, তাতে দেখবেনই তো।

: আগে নয় বাবা। আজই দেখেছি। হল্ ফিল দেখেছি।

: আজই দেখেছেন? কোথায়?

: এই, এইখানে।

: এইখানে? ওহ্ হো, আপনার তো একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনি তো আর হুঁশে নেই। এখানে বাঘ দেখবেন কি করে?

: দেখবো না মানে? এ তুমি কি বলছো বাবা?

'হাটের কাদায় বাপরে বাপ্
আস্ত বাঘের পায়ের ছাপ,
দেখলে সবাই ফুটিয়ে চোখ,
বাঘের পায়ের পাঁচটি নোখ!'

হরিদাস বিভ্রান্তকণ্ঠে বললো– তাতে আপনি দেখলেন কি করে?

সুরতান সাহেব প্রত্যয়ের সাথে বললো–

'হাটে গেল হবা'র মাও,
দেখে এলো বাঘের পাও,
তাঁই কলো মুই শুননু
মরি বাঁচি বাঘ দেখনু!

: বাঘ দেখলেন?

: স্বচক্ষে দেখলাম।

: বুঝেছি! আপনি পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেছেন কত্তা! আপনি আর ইহজগতে নেই।

: নেই? তাহলে কোথায় আছি বাওয়া?

: সেটা বাড়িতে গেলেই টের পাবেন। চলুন...

: এ্যাঁ!

: উঠে দাঁড়ান তো দেখি। দাঁড়াবার শক্তিটা কি আছে?

: আলবত আছে। নেই মানে? আমাকে কি মুর্দা পেয়েছো বাওয়া?

জ্যান্ত মানুষ আমি। এই দেখো আমার শক্তি... বলেই জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন সুরতান সাহেব। হরিদাস তাকে ধরে কাঁধের সাথে লাগিয়ে নিলো এবং বললো– আপনার শক্তি দেখা হয়ে গেছে কত্তা। আর দেখার দরকার নেই। এবার আমার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলুন।

সুরতান সাহেবকে ধরে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো হরিদাস।

০ ০ ০

হরিদাসের কাঁধে ভর দিয়ে এসে সুরতান সাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। হরিদাস সুরতান সাহেবকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে এলে, 'কে কে?' বলে ছুটে এলেন সুরমা বিবি।

হরিদাস বললো– দাদাবাবুকে এনেছি দিদিমণি।

উস্কো খুস্কো চুলে আর ময়লা মাটি ঘামে কিম্ভূৎকিমাকার চেহারার সুরতান সাহেবকে চিনতে পারলেন না সুরমা বিবি। প্রশ্ন করলেন– ওটা কে? তোমার কাঁধে ভর দিয়ে ও কে? ওকে বাড়ির ভেতরে এনেছো কেন?

হরিদাস বললো– এটাই তো ছোট কত্তা দিদিমণি। এটাই দাদাবাবু সুরতান সাহেব।

বিশ্বাস করতে পারলেন না সুরমা বিবি। নাখোশকণ্ঠে বললেন– কি বলছো পাগলের মতো? তাঁর এ চেহারা হবে কেন?

: এই চেহারাই হয়েছে দিদিমণি। নিজে উপার্জন করে খাওয়ার নেশায় মজুর হয়ে উনি বলরাম পালের পুকুর খুড়তে গিয়েছিলেন তো; তাই দাদাবাবুর রোদে ঝলসে যাওয়া আর ময়লা মাটি লাগা চেহারা আপনি চিনতে পারছেন না।

: সে কি সে কি! হায় হায়! কি সর্বনাশ! এই অবস্থা হয়েছে তাঁর! আনো আনো, বারান্দার এই চৌকিতে শুইয়ে দাও! –বলে নিজেই গিয়ে সুরতান সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বারান্দার দিকে আনতে লাগলেন। একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকে লাগায় সুরমা বিবি নাক সিটকিয়ে বললেন– উঁহ্, ছিঃ ছিঃ! এ কিসের গন্ধ?

হরিদাস বললো– গাঁজার আর বমনের গন্ধ দিদিমণি। গাঁজা খেয়ে উনি বমন করেছিলেন।

সুরমা বিবি বললেন– গাঁজা! ইনি গাঁজা খেয়েছিলেন?

: আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি। মাটি টানতে গিয়ে এক গাঁজাখোরের পাল্লায় পড়েছিলেন। ঐ গাঁজাখোরের কুপরামর্শেই গাঁজা খেয়েছেন দাদাবাবু।

: তার মানে, তার মানে! তার কথায় গাঁজা খেলেন কেন?

: বলছি বলছি। আগে কত্তাকে শুইয়ে দিন। সব বলছি।

দু'জনে ধরে সুরতান সাহেবকে বারান্দায় চৌকির উপর শুইয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু বেঁকে বসলেন সুরতান সাহেব। তিনি এবার জড়িতকণ্ঠে বললেন– কেন বাওয়া? আমি শুয়ে পড়বো কেন? আমি কি দুর্বল, না বিমারী? আমি রাজার মতো বসে থাকবো। বসে থেকে হাঁকবো– এই, কে আছিস?

না শুয়ে চৌকির উপর বসে পড়লেন সুরতান সাহেব। হরিদাস বললো– ঐ দেখুন, গাঁজার নেশা উনার এখনো কাটেনি।

সুরমা বিবি সুরতান সাহেবকে শক্তকণ্ঠে বললেন– আপনি গাঁজা খেয়েছেন কেন?

সুরতান সাহেব দাপটের সাথে বললেন– খাবো। একশো বার খাবো। আমাকে রাজা হতে হবে না?

: রাজা হবেন?

: জি হ্যাঁ বাওয়া, রাজা হবো–

'এক ছিলুমে যেমন তেমন, দুই ছিলুমে মজা,

তিন ছিলুমে উজির-নাজির, চার ছিলুমে রাজা

বাওয়া, বাংলাদেশের গাঁজা!' হাঃ–হাঃ–হাঃ! আমি রাজা বনেছি, তুমি বেগম বনে যাও। যাও বাওয়া যাও... বলেই সুরতান সাহেব গড়িয়ে পড়লেন চৌকির উপর এবং হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পড়ে রইলেন চুপচাপ।

সুরমা বিবির কাজের মেয়ে বিজলী বালা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সুরমা বিবি ঝিকে বললেন– বিজলী, ধরো তো। আমার সাথে সাহেবকে ধরো। একে গোসলখানায় নিতে হবে। গোসল করাতে হবে। গায়ের ময়লা মাটি সাফ করে

বমন মাখা কাপড় চোপড় বদল করতে হবে। ধরো ধরো। হরিদাস, তুমিও একটু সাহায্য করো।

সুরমা বিবি সুরতান সাহেবকে তুলতে গেলেন। হরিদাস বাধা দিয়ে বললো– না না, খরবদার দিদিমণি! গরম শরীরে আর ঘর্মাক্ত অবস্থায় দাদা বাবুকে গোসল করালে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্দিগর্মি হয়ে যাবে। আগে শরীরের তাপ ঠাণ্ডা করতে হবে আর গায়ের ঘাম শুকাতে হবে। তারপর গোসল।

সুরমা বিবি বললেন– তাহলে?

হরিদাস বললো– জল দিয়ে মাথাটা ধুইয়ে দিন আর পাখার জোর বাতাস দিন। ঘাম শুকালে আর শরীর ঠাণ্ডা হলে তখন গোসল করাবেন।

তাই করা হলো। কাজের ঝি বিজলী বালা পানি দিয়ে সুরতান সাহেবের মাথা ধুয়ে দিলো। সুরমা বিবি সুরতান সাহেবের শিয়রে বসে পাখার বাতাস দিতে লাগলেন। মাথায় পানি পড়ায় আর গায়ে বাতাস লাগায় সুরতান সাহেব বেশ আরাম বোধ করলেন। তাই কোন প্রতিবাদ না করে চুপচাপ শুয়ে রইলেন তিনি।

বাতাস দিতে দিতে সুরমা বিবি হরিদাসকে বললেন– এবার বলো তো হরিদাস, ঘটনা কি? উনি মজুর খাটতে গেলেন কেন আর গাঁজিলের কথায় গাঁজাই বা খেলেন কেন?

হরিদাস এবার মাথা নিচু করে অপরাধীর কণ্ঠে বললো– দোষটা বলতে আমারই দিদিমণি। আমি শুয়ে বসে খাচ্ছি আর আরামে দিন কাটাচ্ছি বলে দাদাবাবু আমাকে যথেষ্ট অপমান করায় আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি রাগের মাথায় বলেছিলাম– 'শুয়ে বসে আরামে দিন কাটাচ্ছেন তো আপনি। নিজে কোন উপার্জন না করে শ্বশুরের পয়সায় বসে বসে খাচ্ছেন। আমি খেটে খাই। কোন উপার্জন না করে পরের পয়সায় বসে বসে খেতে আপনার রুচিতে বাধে না। আমি হলে অন্তত আমার রুচিতে বাধতো।

সুরমা বিবি বললেন– এই কথাই বলেছিলে? তাই তো! আগের দিন তোমার সম্বন্ধে ইনি এই কথাই বলেছিলেন।

: আজ্ঞে দিদিমণি। উনি যা বলেছিলেন, ঠিকই বলেছিলেন। দোষটা আসলে আমারই হয়েছিল। উনি মুনিব। উনি দুই কথা বলতেই পারেন। সেজন্যে আমার এমন উক্তি করাটা মোটেই ঠিক হয়নি।

: আচ্ছা! তারপর?

: আমি বুঝতে পারছি, আমার কথাটাই দাদাবাবুর আত্মসম্মানে যথেষ্ট লেগেছিলো। তাই আজ উনি উপার্জনের ধান্দায় বেরিয়ে ছিলেন।

: তা বেরুলেন, ঠিক আছে। কিন্তু উনি মজুর খাটতে গেলেন কেন?

: ওখানকার লোকজনের কাছে আমি সব শুনেছি দিদিমণি। উপার্জনের কোথাও কোন পথ না পেয়ে, বলরাম পালের পুকুর কাটা মজুরদের কথায় উনি শেষ মেষ মজুর খাটতেই রাজী হন আর পুকুরের মাটি টানতে লেগে যান।

: তারপর?

: অনভ্যস্ত শরীর। অল্পক্ষণেই ক্লান্ত হয়ে উনি দম নিতে পুকুরের পাড়ে উঠে বসেন। দুর্ভাগ্যবশত উনি যার পাশে বসেন, সে ছিল একজন মাতাল। ঐ মাতালই উনাকে গাঁজা খেতে উদ্বুদ্ধ করেন।

: কিভাবে?

: ঐ মাতাল বলে, মাটি টানা কাজ শক্তির কাজ। আপনার শক্তি ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। এই গাঁজা কোন খারাপ জিনিস নয়। এটা বল বৃদ্ধিকারক ঔষধ। একটা টান দিয়ে দেখুন, আপনার শরীরে যাদুর মতো বল ফিরে আসবে।

: তারপর?

www.boighar.com

: সে সময় দাদাবাবুর পেছনে অন্য একজন মজুর বসেছিল। দাদাবাবু তা লক্ষ্য করেননি। ঐ মজুর গাজিলের সকল কথাই শুনেছিল। শুধু মজা দেখার জন্যে কোন প্রতিবাদ না করে সে চুপ করেছিল। দাদা বাবুর সব কথাও সে শুনেছিল। ঐ মজুরের কাছেই শুনলাম সব।

www.boighar.com

: কি শুনলে?

: সেই মজুরের কাছে শুনলাম, দাদাবাবু ঐ গাঁজিলের কথায় কিছু ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু গাঁজিলের জোর সুপারিশে দাদাবাবু গাঁজার কলকেয় জোরে একটা টান মারেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান আর বমন করে ফেলেন।

: আচ্ছা!

: গাঁজার কলকের ঐ এক টান দেয়ার ফলেই উনি নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছেন।

এই সময় সুরমা বিবির মা-বাবা আর বাড়ির সকল দাসদাসী 'কি হয়েছে, কি হয়েছে' বলে ছুটে এলেন সেখানে। এসেই সুরমার মা ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– ঘটনা কি সুরমা? জামাই নাকি মাতাল হয়ে বাড়িতে এসেছে? মাতাল হলো কি কারণে?

Boighar & BABD

সুরমা বিবি বললেন– সে অনেক কথা। সেসব কথা পরে বলবো মা। দেখছেন না, ময়লামাটি আর নোংরা কি সব লাগিয়ে চেহারা কি বিশ্রী করে এসেছেন? বেজায় দুর্গন্ধ ছুটছে। এখনই এঁকে গোসলখানায় নিতে হবে।

সুরমার মা চাপ দিয়ে বললেন– তাহলে ধরে নিয়ে বসে আছো কেন? এখনো কেন গোসলখানায় নিয়ে যাওনি?

: যাচ্ছি মা, এখনই যাচ্ছি... বলেই সুরমা বিবি নিজের কাজের ঝি বিজলী বালাসহ মায়ের একজন কাজের ঝিকে ডেকে নিয়ে তিন জনে ধরাধরি করে সুরতান সাহেবকে গোসলখানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে নিয়ে আগে সুরতান সাহেবের মাথায় অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা পানি ঢাললেন। তারপর তাঁর সারা শরীর সুন্দরভাবে পরিষ্কার করলেন। নোংরা কাপড় ছাড়িয়ে পরিষ্কার কাপড় পরালেন। এসব করে সুরমা বিবি তাঁকে যখন ঘরে এনে বসালেন, তখন সুরমা বিবি দেখলেন– সুরতান সাহেবের মাতলামো অনেকটাই কমে গেছে।

সুরতান সাহেব সকাল থেকে সারাদিন অনাহারে ছিলেন। অতঃপর সুরমা বিবি যখন তাঁর মুখে খাবার তুলে দিতে লাগলেন, তখন সুরতান সাহেব গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন। খেতে খেতে অনেক পরিমাণ খাবার তিনি খেয়ে ফেললেন এক সাথে। এতে করে শরীর তাঁর ভারী হয়ে গেল। চোখে ঘুম নেমে এলো। তাঁকে শুইয়ে দেয়া হলে, সারারাত তিনি বিভোর হয়ে ঘুমালেন। একটানা দীর্ঘ ঘুমের পর সুরতান সাহেব সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন, তখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ মানুষ। নেশার লেশমাত্রও আর তাঁর মধ্যে রইলো না। সজ্ঞানে ফিরে এসেই তিনি তাঁর বিবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন– এই যে বিবিসাহেবা! উঠো উঠো। সকাল হয়ে গেছে। ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে না? অজুর পানি দাও...!

স্বামীর কথা শুনে সুরমা বিবি বুঝতে পারলেন, স্বামী তাঁর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন। এতে করে তিনি মহানন্দে উঠে পড়লেন বিছানা থেকে। স্বামীকে অজুর পানি দেয়ার পর নিজেও অজু করে এলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জন এক সাথে নামাজ আদায় করলেন।

নামাজ শেষে দু'জন মুখোমুখি বসলেন। কথা বললেন সুরমা বিবিই আগে। তিনি বললেন– কি সাহেব, গতকালের কথা মনে আছে কিছু?

বুঝতে না পেরে সুরতান সাহেব বললেন– গতকালের কথা মানে?

: মানে, গতকাল কি করলেন, কিভাবে সারাদিন কাটালেন, সেসব কথা মনে পড়ছে কিছু?

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন সুরতান সাহেব। তারপর ধীরে ধীরে বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে। মনে পড়ছে।

সুরমা বিবি বললেন– উপার্জনের ধান্দায় বেরিয়ে পড়লেন সকালে, সে কথা?

: জি। মনে পড়ছে সে কথা।

: বলরাম পালের মজুর হয়ে তাঁর পুকুরের মাটি টানতে লাগলেন, সেটা মনে পড়ছে না?

: পড়ছে পড়ছে।

: গাঁজা খাওয়ার কথা? পাড়ে উঠে এসে গাঁজা খেলেন এক গাঁজিলের কথায়, সেটা?

সুরতান সাহেব এবার লজ্জিতকণ্ঠে বললেন– জি হ্যাঁ। পড়ছে পড়ছে, এখন সব মনে পড়েছে। সে বদ নসীবের কথাও পুরোপুরি মনে পড়েছে আমার। ছিঃ ছিঃ। কি যে দুর্মতি আমার হলো!

সুরমা বিবি টিপ্পনী কেটে বললেন– খেয়াল আছে? খেয়াল আছে তাহলে?

: জি, পুরোপুরিই খেয়াল আছে। এখন আর কিছুই আমার খেয়ালের বাইরে নেই। সব কিছু খেয়ালে এসেছে।

: সাব্বাস! তারপর? তারপর কি হলো, তা কি মনে আছে?

: না বিবি। গাঁজায় টান দেয়া পর্যন্ত মনে আছে সব কিছু। গাঁজায় টান দেয়ার পর আর কিছুই মনে নেই আমার।

: আর কিছুই খেয়ালে আসছে না?

: না, কিছুই না।

: কিছুই না?

: না। তবে একটা বিষয় বার বার মনে জেগেছে আমার।

: একটা বিষয়! কি বিষয়?

: আমার মনে জেগেছে, আমি একজন রাজা।

: রাজা! যাব্বাবা! একদম রাজা?

: জি জি। আমার বার বার মনে হয়েছে– আসলেই আমি একজন রাজা।

: খাইছে রে! কোন রাজ্যের?

: জি?

: কোন রাজ্যের রাজা? কোথায় আপনার রাজধানী?

Boighar & BABD

: না বিবি! সেসব বিষয় কিছুই খেয়ালে আমার আসেনি। একবারও আর একবিন্দুও সেসব কথা মনে জাগেনি আমার।

: শুধুই মনে হয়েছে, আপনি একজন রাজা?

: জি জি। তাই মনে হয়েছে।

: ঢাল নেই, তলোয়ার নেই। নিধিরাম সর্দার!

: জি?

: রাজা কখনো মজুর খাটে?

: জি না, তা খাটবে কেন?

: রাজা কখনো গাঁজা খায়?

: তওবা! রাজা গাঁজা খাবে কেন?

: তাহলে কি করে আপনার খেয়াল হলো, আপনি একজন রাজা? মজুর খাটলেন, গাঁজা খেলেন, তবু আপনার খেয়াল হলো, আপনি একজন রাজা?

: মনের ভুল বিবি, ওসব আমার মনের ভুল। ঐ যে গাঁজিলটা গাইলো– 'চার ছিলুমে রাজা?' ঐ কথা থেকেই হয়তো এ খেয়ালটা হয়েছে।

: এমন খেয়াল আর কখনো মনে আনবেন না তো?

: জি না, জি না। পাগল! আর কখনো এসব মনে স্থান দিই!

: মজুর খাটতে যাবেন নাতো আর?

: না না। আর কখনো মজুর আমি খাটবো না।

: উপার্জনের ধান্দা তো কখনো আর করবেন না?

: জি না। তুমি যখন বলছো, তখন সে ধান্দাও আর করবো না। তবে...

: তবে, উপার্জন না করে পরের পয়সা খেতে আপনার রুচিতে বাধবে, এই তো?

: জি জি। এক্কেবারে ঠিক কথা বলেছো।

: সত্যিই কি পরের পয়সা খাচ্ছেন আপনি এ যাবত?

: তা নিজের পয়সা নয় যখন, তখন পরের পয়সা বৈ কি।

: আমার বাপ আমাকে অঢেল পয়সা দিয়েছেন, তা জানেন?

: হ্যাঁ, তা শুনেছি।

: তাহলে আমি আপনার কে?

: কেন? আমার বউ।

: শুধুই বউ? আমি আপনার আর কিছুই নই?

Boighar & BABD

: আর কিছু নও মানে? তুমিই তো আমার সব। তুমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কে আছে আমার? তুমিই আমার একান্ত আপনজন। আমার একমাত্র নিজের জিনিস।

: তাই? তাহলে মানে, আমি আপনার নিজের জিনিস হলে, আমার পয়সা আপনার নিজের পয়সা নয়?

: এ্যাঁ? হ্যাঁ, নিজেরই তো। অবশ্যই আমার নিজের পয়সা।

: নিজের এত পয়সা থাকতে কষ্ট করে উপার্জন করা নিয়ে মাথা ঘামায় কেউ?

: না, তা ঘামানো ঠিক নয়।

: তাহলে আপনি ঘামান কেন? নিজের এত পয়সা থাকতে আপনি যে কষ্ট করে উপার্জন করতে চান, এটা কি ঠিক?

: তা মানে, না, এটা ঠিক নয়।

: ঠিক নয়তো?

: না, ঠিক নয়।

: ঠিক বলছেন?

: জি, ঠিক বলছি।

: একদম ঠিক?

: ঠিক ঠিক, একদম ঠিক।

হেসে ফেললেন সুরমা বিবি। হাসতে হাসতে বললেন– ওরে আমার পাগলা পীর রে। নিন, উঠুন। নাশতার সময় হয়ে গেছে। নাশতা খাবেন চলুন।

সুরতান সাহেব বললেন– এ্যাঁ! নাশতার সময় হয়ে গেছে?

: অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। নিন, উঠুন উঠুন! চলুন শিগগির...!

: যথাদেশ মহারানী, আমার সুরমা বাণী, চলুন...

দু'জন এক সাথে হাসতে হাসতে নাশতা খেতে চলে গেলেন।

৭

শেখ আবদুল আজিজের ব্যবসায়ী জাহাজের প্রশস্ত কামরায় বসে হাজী খলিল পীর শাহজাদা শাহ সুলতানের কাহিনী গুরুদাসকে বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলেন। গুরুদাসের অনুরোধে শাহ সুলতান সাহেবের একটি প্রিয় গান 'রসূল নামের ফুল এনেছিরে, আয় গাঁথবি মালা কে?' অতিশয় উচ্চকণ্ঠে গাইতে গিয়ে হাজী খলিফা পীরের দম বন্ধ হয়ে গেল। তিনি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

হাজী খলিল পীরের ভক্ত ও জাহাজের মালিক শেখ আবদুল আজিজ সাহেব তার লোকজন নিয়ে এসে দীর্ঘ সময় শুশ্রূষা করার ফলে পীর সাহেবের জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। এতে করে শেখ আবদুল আজিজ সাহেব হাজী খলিল পীর সাহেবকে গান-গীত আর গল্প আলাপ বন্ধ করে পুরো এক মাস বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়ে গেলেন। শুধু পরামর্শ দেয়াই নয়, পুরো এক মাস নীরব থাকতে রীতিমত চাপ দিয়ে গেলেন।

এতে করে পীর সাহেব বন্ধ করলেন কথা বলা। অতি প্রয়োজনীয় দুই চারটে কথা ছাড়া সকল কথাবার্তা বন্ধ করলেন তিনি। বন্ধ হয়ে গেল শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনী বর্ণনা করা।

সেই থেকেই নীরব আছেন খলিল পীর সাহেব। এক মাসের জায়গায় দেড় মাস পার হয়ে গেছে, তবু গান গীত পড়ে মরুক, শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনী বলা চুলোয় যাক, দুই চারটি অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া গুরুদাসের সাথে আর কোন কথাই বলেননি তিনি। অথচ শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনী শোনার কি প্রচণ্ড আগ্রহই না ছিল এই গুরুদাসের।

দীর্ঘ দেড় মাস পরে এই কথা খেয়াল হলো হাজী খলিল পীর সাহেবের। কাহিনী শোনা তো দূরের কথা, কথা বলারও কোন লোক না থাকায় বেচারা গুরুদাস যে চরম যাতনার মধ্যে আছে, এ কথা খেয়াল হওয়ায় পীর সাহেব নিজেও বড়ই যাতনা বোধ করলেন। তাই, অনেকদিন পর গুরুদাসকে কাছে আসার জন্যে ডাক দিলেন পীর সাহেব।

ডাক শুনে গুরুদাস উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে ছুটে এসে পীর সাহেবকে বললো– জি হুজুর, কিছু লাগবে? কোন কিছুর দরকার আছে হুজুর?

Boighar & BABD

পীর সাহেব বললেন– দরকার!

গুরুদাস বললো– আমাকে ডাক দিলেন যে হুজুর!

পীর সাহেব বললেন– আমার কোন কিছু দরকারের জন্যে নয় গুরুদাস, আমি তোমাকে ডাক দিলাম তোমার খবর জানার জন্যে।

: আমার খবর!

: হ্যাঁ। কেমন আছো তুমি?

: হুজুর!

: ভাল আছো তো?

: ভাল? জি হ্যাঁ–হ্যাঁ। ভাল আছি হুজুর, খুবই ভাল আছি।

: খুবই ভাল আছো?

: থাকবো না হুজুর! ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি, চমৎকার জায়গায় শোয়া বসা করছি। এরপরও ভাল থাকবো না তো, আর কিসে ভাল থাকবো হুজুর?

: কথাটা তুমি ঠিক বললে না গুরুদাস।

: হুজুর!

: তুমি ভাল নেই।

: আমি ভাল নেই?

: হ্যাঁ, ভাল নেই।

: কি করে বুঝলেন হুজুর?

: তোমার চেহারা দেখে। তোমার চোখ মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন? চেহারাটা এমন বিবর্ণ হয়েছে কেন? মনমরা কেন দেখাচ্ছে তোমাকে?

: আমাকে মনমরা দেখাচ্ছে হুজুর?

: দেখাবে না? শুধু ভাল খেলে আর ভাল জায়গায় শুলেই কি ভাল থাকে মানুষ? কথা বলার লোক না থাকলে, সে মনমরা তো হবেই। সব সময় মুখ বন্ধ থাকলে কি জীবন্ত থাকে মন? আপছে আপ মরে যায় ওটা।

: হুজুর!

: গল্প আলাপ করার তো পাওনি কাউকে এ যাবত?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গুরুদাস বললো– কাকে পাবো হুজুর? গল্প আলাপ করার লোকজন সব বাড়িতে ফেলে রেখে মূর্খামির খেসারত দিতে আমি ভিন্ন দেশে চলেছি। গল্প আলাপ করবো আর কার সাথে হুজুর!

Boighar & BABD

পীর সাহেব বললেন– তা ঠিক। আগে আমি তোমার সাথে গল্প আলাপ করতাম। আমিও তা বাদ দিয়ে বসে আছি। কতদিন তোমার সাথে গল্প আলাপ করিনি। মন তোমার সতেজ থাকবে কি করে?

: হুজুর!

: আমার এতদিন নীরব থাকা ঠিক হয়নি। তোমার সাথে গল্প আলাপ করা উচিত ছিল আমার।

: না না, তা করবেন কি করে হুজুর! আপনি তো অসুস্থ মানুষ।

: না গুরুদাস। আমি আর অসুস্থ নই। অনেক আগেই সুস্থ হয়ে গেছি।

: বড়ই সুখবর হুজুর। ঈশ্বরকে শত কোটি ধন্যবাদ দিই সে জন্যে।

: তোমার আর গল্প শোনার ইচ্ছে হয় না?

: গল্প?

: হ্যাঁ, গল্প। মানে, কাহিনী। শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনী শোনার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল তোমার। সে আগ্রহ বুঝি আর তোমার নেই?

গুরুদাস চমকে উঠে বললো– ওরে বাপরে! না না হুজুর, সে আগ্রহ আমার আর কিছুমাত্র নেই।

পীর সাহেব বললেন– কেন নেই?

: একবার সে আগ্রহ প্রকাশ করে আপনাকে মেরে ফেলতে বসেছিলাম হুজুর। ঈশ্বর দয়া করে আপনাকে প্রাণভিক্ষে দিলেন বলে আপনি বেঁচে গেলেন। আবার সে আগ্রহ প্রকাশ করে মেরে ফেলবো আপনাকে?

: আরে সেটা গান করার জন্যে। চিৎকার করে গান করতে গিয়েছিলাম বলেই ঐ অবস্থা হয়েছিল। তুমি অনুরোধ করলেও তো গান আমি আর গাইবো না। কিন্তু গল্প-কাহিনী শোনাতে তো দোষ কিছু নেই। শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনী আর শুনতে চাও না তুমি?

: শুনতে চাই মানে কি? সে আগ্রহ তো আমার প্রচণ্ড। কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে সে কাহিনী কি আর আপনি শোনাতে পারবেন হুজুর? আবার যদি হঠাৎ কিছু ঘটে যায়?

: না না, ধীরে ধীরে আর মাঝে মধ্যে শোনালে কোন অসুবিধে হবে না।

: হবে না হুজুর?

: না। সপ্তাহ খানেক পর পর একদিন করে ধীরে ধীরে শোনালে কোন অসুবিধেই হবে না।

Boighar & BABD
বিপুল উৎসাহভরে গুরুদাস বললো– তাহলে তাই শোনান হুজুর। সপ্তাহ খানেক কেন, মাস খানেক পর পর শোনালেও আমার কোন আপত্তি নেই। দীর্ঘদিন আছি আমি আপনার সাথে। তবু কাহিনীটা তো শোনা হবে আমার।

: এক মাস নয়, এক সপ্তাহ পর পরই শোনাবো। আজ তাহলে আবার শুরু করি, কি বলো?

: জি হুজুর, জি হুজুর, করুন করুন। দয়া করে শুরু করুন আবার... বলেই গুরুদাস ফের চমকে উঠে বললো– না হুজুর, দরকার নেই। এই জাহাজের মালিক নিজে নিষেধ করে গেছেন। তাঁর নিষেধ অমান্য করে আবার গল্প আলাপ করতে দেখলে, ভয়ানক ক্ষেপে যাবেন তিনি। হয়তো আমাদের এই আরাম-আয়েশের খাওয়া থাকাও বন্ধ করে দিতে পারেন।

: আরে না না, সেটা তিনি কোনদিনই করবেন না। আমার এতটুকু অসুবিধে হোক, প্রাণান্তেও তিনি সেটা চাইবেন না। শুধু আবার গান গাইতে দেখলে তিনি একটু নাখোশ হবেন– এর বেশি নয়।

: গল্প আলাপ করতে দেখলে?

: তিনি খুশিই হবেন। আমি যে আবার প্রাণখুলে কথাবার্তা বলছি, এটা দেখলে উনি খুশিই হবেন। কারণ, দীর্ঘ দিন মুখ বন্ধ করে থাকলে যে মানুষ দম ফেটে মারা যায়– সেটা তিনি বোঝেন।

: জি আচ্ছা। তাহলে আবার শুরু করুন।

: আগের ঘটনাগুলো মনে আছে তো?

: কোন ঘটনা হুজুর?

: ঐ যে শাহ সুলতান সাহেব রাজা হলেন, তারপর সিংহাসন ত্যাগ করে তিনি সুফী হলেন, সুফী হওয়ার পর দীক্ষাগুরুর আদেশে তিনি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাত্রা করলেন–

কথার মাঝেই গুরুদাস বললো– জি জি; এগুলো মনে আছে হুজুর। উনি সসৈন্যে মাছের আকৃতি বিশিষ্ট জাহাজে চড়ে বাংলাদেশ যাত্রা করলেন। আপনি সঙ্গে ছিলেন, উনার গান শুনে সে গান আমাকে শোনাতে গিয়ে আপনি জ্ঞান হারালেন– এ পর্যন্ত জানি। এরপর কি হলো, সেটা বলুন হুজুর।

হাজী খলিল পীর আবার এক সপ্তাহ পর পর বলে চললেন কাহিনী–

শাহজাদা তথা রাজা, শাহ সুলতান সাহেব আমাকে, ফৌজদার নূর মুহম্মদ সাহেবকে এবং নূর মুহম্মদের বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মাছের আকৃতি বিশিষ্ট মস্তবড় জাহাজে আরোহণ করলেন। রাজা শাহ সুলতান ফৌজদার নূর মুহম্মদকে তাঁর

সৈন্য বাহিনীসহ জাহাজের সবচেয়ে বড় একটা কামরায় তুলে দিলেন। সব চেয়ে বড় কামরা হলেও, সে কামরাটা ছিল সাদামাটা। আমাকে নিয়ে রাজা সাহেব যে কামরায় উঠলেন, সে কামরাটা অপেক্ষাকৃত ছোট কামরা হলেও সেটা ছিল জাহাজের সবচেয়ে সুন্দর, সাজানো গুছানো, খোলামেলা ও সুসজ্জিত কামরা। বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলো জাহাজ। ভাবলাম, শাহ সুলতান সাহেবের সাথে মজার মজার গল্প আলাপ করে করে আরামে বাংলাদেশে পৌঁছবো আমরা। কিন্তু সে গুড়ে বালি। প্রাণভরে গল্প আলাপ করাতো দূরের কথা, কদাচিত দুই চারটে কথা ছাড়া শাহ সুলতান সাহেব আমার সাথে আর কথাই বললেন না। অবশ্য সে অবকাশও তাঁর ছিল না। নিজের বিছানায় তিনি সেই যে শুয়ে পড়লেন, ব্যস! ঐভাবেই তিনি আধ্যাত্মিক জগতে চলে গেলেন আর আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনায় বিভোর হয়ে রইলেন। আমার বিছানায় বসে আমি হতবুদ্ধি। শাহ সুলতান সাহেব আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে এমনই বিভোর হয়ে রইলেন যে, আহার নিদ্রার কথাটাও প্রায় ভুলে গেলেন তিনি। সব সময় তলিয়ে রইলেন অন্য জগতে। এ জগতে তাঁর কোন অস্তিত্বই পাওয়া যেতো না যদি তিনি মাঝে মাঝেই গুন গুন করে আধ্যাত্মিক গান না গাইতেন। বিশেষ করে ঐ গানটা– 'রসূল নামের ফুল এনেছিরে, আয় গাঁথবি মালা কে?' ঐ গানটা না গাইতেন।

আমার অবস্থা হলো, না ঘরকা, না ঘাটকা। কথা বলার কেউ না থাকায়, আমাদের খেদমতে নিয়োজিত চাকর নফরদের সাথে কথা বলে বলে আর মাঝে মাঝে কামরার বাইরে এসে আকাশের তারা গুনে গুনে আমার দিন কাটতে লাগলো।

আমাদের দীক্ষাগুরু সুফী শ্রেষ্ঠ শেখ তওফিক সাহেব আমাকে দেহরক্ষী ও উপদেষ্টা হিসাবে শাহ সুলতানের সাথে দিলেন। বলে দিলেন, শাহ সুলতান সাহেব কোন কিছু ভুল করতে লাগলে তা সংশোধন করে দিতে আর কোন কিছুতে আধিক্য করতে লাগলে তাঁকে নিরস্ত করতে। অর্থাৎ থামিয়ে দিতে। কিন্তু তা হতোস্মি! যিনি কোন কাজ করতেই লাগলেন না, তাঁর ভুল সংশোধন করবো কি, আধিক্যই বা থামিয়ে দিবো কি? এক্ষণে আধিক্য বলতে আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে তাঁর আধিক্য। কিন্তু সেটা তো থামিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। আধ্যাত্মিক জগতে যিনি যত গভীরভাবে তলিয়ে যেতে পারবেন, আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি তত সফলকাম হবেন। সুতরাং থামিয়ে দিলে তো আর আধ্যাত্মিক জীবনে সফলতা কিছু আসে না! সুফী জীবন সার্থকও হয় না। তাই চাকর

বাকরদের সাথে কথা বলে বলে আর আকাশের তারা গুনে গুনে আমার দিন কাটতে লাগলো।

আমার এই যন্ত্রণার পুরোপুরি অবসান ঘটলো আমাদের জাহাজ চট্টগ্রাম ঘাটে পৌঁছার পর। জাহাজ ঘাটে জাহাজ পৌঁছামাত্র শাহ সুলতান সাহেব তাঁর আধ্যাত্মিক জগতের অচেতন অবস্থা থেকে পার্থিব জগতের চেতনায় ফিরে এলেন এবং আলস্য ঝেড়ে ফেলে দীপ্ত পদক্ষেপে জাহাজ থেকে নেমে এলেন ডাঙ্গায়।

আমাদের জাহাজ চট্টগ্রাম জাহাজ ঘাটে পৌঁছামাত্র জনতার ঢল নামলো ঘাটের কাছাকাছি স্থানে। আমাদের মাছের আকৃতি বিশিষ্ট জাহাজটা দেখে উপস্থিত জনগণের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে প্রশ্ন করতে লাগলো– আরে ভাই, এটা কি? মাছ, না জাহাজ?

জবাবে কেউ কেউ বললো– মাছ মাছ। দেখছো না, এটা একটা আস্ত সামুদ্রিক মাছ। আমাদের জাহাজ ঘাটে এসে ভেসে উঠেছে মাছটা।

অন্য কয়েকজন প্রতিবাদ করে বললো– তা কি করে হবে? মাছ কি কখনো এতবড় হয়? তা ছাড়া, মাছ হলে তো নড়ন চড়ন থাকবে। এটা কোন জৈব পদার্থ নয়। অজৈব পদার্থ। দেখছো না, কাঠ লোহা দ্বারা নির্মিত এটা একটা সমুদ্র তরী। অর্থাৎ জাহাজ?

খেয়াল করে দেখে সবাই বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তোরে ভাই, এটা তো একটা জাহাজই বটে। কিন্তু হঠাৎ দেখলে কার সাধ্য আছে, মাছ ছাড়া এটাকে জাহাজ বলে ভাবে?

অনেকেই ফের বললো– ঠিক ঠিক! আস্ত একটা মাছ এটা। জীবন্ত না হোক, কাঠের মাছ তো বটেই!

সেসময় জাহাজ থেকে ঘাটে নেমে এলেন শাহ সুলতান সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আর এক নাটক। শাহ সুলতান সাহেবের অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখে হতবাক হয়ে গেল জনগণ। অর্থাৎ আর এক বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হলো উপস্থিত জনতা। অনেকেই বলে উঠলো– হায় ভগবান, এতো স্বয়ং দেবদূত! এখানে স্বয়ং দেবদূতের আবির্ভাব ঘটলো কি করে?

দূরে দাঁড়িয়ে থেকে জনগণ দেবদূতকে প্রণাম করতে লাগলো। শাহ সুলতান সাহেব সেটা লক্ষ্য না করে আমাকে বললেন– হাজী সাহেব, নেমে আসুন। সামনের ঐ লোক বসতির মধ্যে আগে আমরা যাই, আসুন...

Boighar & BABD

এবার জনগণ বলে উঠলো– আরে! ইনি তো মানুষ। দিব্যি মানুষের মতো কথা বলছেন! হায় ভগবান! মানুষের চেহারাও এমন দেবতুল্য হয়! এমন মানুষ এখানে কেমন করে এলেন!

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জবাব দিলেন– মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছেন। দেখছো না, ঐ মাছের পিঠ থেকে উনি নেমে এলেন!

অনেকে বললো– তার মানে, উনি মাহি সওয়ার? মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে আসা লোক?

জবাব এলো– হ্যাঁ হ্যাঁ, মাহি সওয়ার। মাহি আছোয়ার।

এদের কথায় কান না দিয়ে আমরা দু'জন বসতির দিকে চলে গেলাম। উল্লেখ্য যে, ঘাটের লোকজনের মুখে মুখে শাহ সুলতান সাহেবের এ পরিচিতি ছড়িয়ে গেল লোক বসতির মধ্যে। চট্টগ্রামে এসে মাহি সওয়ার বা মাহি আছোয়ার নাম হলো শাহ সুলতান সাহেবের। অতঃপর এখান থেকেই শাহ সুলতান সাহেবের এ নাম বাংলাদেশে পাকাপোক্ত হয়ে গেল।

সে যাই হোক, ফৌজদার নূর মুহম্মদ সাহেব আর তাঁর সেপাইদের জাহাজে রেখে আমরা চট্টগ্রামের লোক-বসতির অভ্যন্তরে ঢুকে গেলাম। আমাদের গমনপথে শাহ সুলতান সাহেবের অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতি অভিভূত নয়নে চেয়ে রইলো রাস্তার দু'পাশের নরনারী। তাদেরও অনুচ্চ কণ্ঠের বিস্ময় কানে আসছিল আমাদের। জনগণের কৌতূহল ঠেলে জনবসতির গভীরে প্রবেশ করে আমরা তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলাম, ইসলামের আলো ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে কিছু জায়গায় পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা বেশ কিছু মুসলমান এখানে আগে থেকেই আছেন। আমরা দেখলাম, তাঁরা অনেকেই বেশ প্রভাবশালী ও অর্থশালী লোক। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই তাঁরা অর্থশালী হয়েছেন।

আরব দেশ থেকে কিছু লোক অর্থাৎ মুসলমান এখানে এসেছেন শুনেই এই চট্টগ্রামের মুসলমানেরা ছুটে এলেন আমাদের কাছে। এসেই প্রথমে তারা অভিভূত হয়ে গেলেন শাহ সুলতান সাহেবের ফেরেশতাতুল্য চেহারা দেখে। তাঁরা সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর এঁদের মধ্যেকার একজন নেতৃস্থানীয় মুরুব্বী যাঁকে 'ইমাম সাহেব' বলে সবাইকে সম্বোধন করতে শুনলাম, সেই ইমাম সাহেব শাহ সুলতান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন– জনাব কি ব্যবসায়ী লোক? এই চট্টগ্রামে এসেছেন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কি?

Boighar & BABD

জবাবে শাহ সুলতান সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন– জি না জনাব। ব্যবসা-বাণিজ্য বা পার্থিব কোন কাজ কারবার নিয়ে আমি এখানে আসিনি। আমি এখানে এসেছি ইসলামের খেদমত করতে।

শুনে আরো উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন চট্টগ্রামের এই মুসলমানেরা। ঐ নেতৃস্থানীয় লোকটি, অর্থাৎ ইমাম সাহেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন– মারহাবা! মারহাবা! তা কি ধরনের খেদমত করতে চান জনাব? মানে একটু স্পষ্ট করে যদি বলেন...

এবার কথা বললাম আমি। শাহ সুলতান সাহেবের প্রতি ইংগিত করে বললাম– ইনি একজন সুফী জনাব। ইনি এদেশে এসেছেন ইসলাম প্রচারের কাজে।

সঙ্গে সঙ্গে এক গগনভেদী আওয়াজে চমকে উঠলাম আমরা। ঐ ইমাম সাহেব বজ্রনাদে আওয়াজ দিলেন– নারায়ে তকবির! উপস্থিত মুসলমানগণ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে আওয়াজ দিলেন– আল্লাহু আকবর!

এরপর ঐ ইমাম সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন– আপনি? আপনি কে জনাব?

শাহ সুলতান সাহেবের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে আমি বিনীতকণ্ঠে বললাম– আমি এই সাহেবের সঙ্গী হয়ে এসেছি জনাব। তাঁর দেখভাল করতে এসেছি।

: আলহামদুলিল্লাহ! তা জনাবের নাম?

: আমার নাম আলহাজ খলিল পীর। খলিল পীর বলেই সবাই আমাকে জানে।

: সোবহান আল্লাহ! আর এই জনাবের নাম? মানে এই সুফী সাহেবের নাম?

: এই সুফী সাহেবের নাম সুলতান সাহেব।

: বেশ বেশ! আহা! কি নূরানী চেহারা এই সুফী সাহেবের।

: হবেই তো জনাব। ইনি যে একজন রাজপুত্র!

চমকে উঠলেন সবাই। বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে ইমাম সাহেব বললেন– রাজপুত্র?

আমি বললাম– এক্ষণে রাজা।

: সে কি! সে কি!!

: আরবের বলখ রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন ইনি। পিতার ইন্তেকালের পর ইনিই রাজা হয়ে বলখ রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

: সোবহান আল্লাহ! একজন রাজা ইসলাম প্রচারে এদেশে এসেছেন?

: জি, তাই এসেছেন। মসনদ আর সম্পদ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে অতিষ্ট হয়ে তিনি মসনদ ত্যাগ করেছেন আর সুফী জীবন গ্রহণ করে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই রাজা বাহাদুর আপনাদের দেশে এসেছেন।

Boighar & BABD

: খোশ আমদেদ, খোশ আমদেদ। দয়া করে আপনারা আমাদের মেহমানদারী কবুল করুন।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন– এই মেহমানদের মেহমানদারী আমি করবো, আমি করবো। আসুন জনাবেরা, আমার মেহমনদারী কবুল করে আমার গৃহে আসুন।

সকলের এই কাড়াকাড়ি দেখে শাহ সুলতান সাহেব বললেন– আহহা! আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কারোই মেহমান হতে হবে না আমাদের। চলার মতো সংগতি আমরা সাথে করেই এনেছি।

ইমাম সাহেব বললেন– তা এনেছেন, বেশ করেছেন। আমাদের দেশে এসেছেন, দয়া করে মেহমানদারী করার সুযোগটা আমাদের দিন।

: মেহমানদারী করবেন আপনারা? কিন্তু মানুষ তো আমরা শুধু এই দু'জন নই। জাহাজঘাটে জাহাজ আছে আমাদের। সেই জাহাজে একজন ফৌজদারসহ আমাদের বিশ পঁচিশ জন সেপাই আছে। আরো আছে জাহাজের চাকর নফর চালকেরা। সর্বমোট তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন মানুষ আমরা। এত লোকের মেহমানদারী করবেন আপনারা কি করে?

ইমাম সাহেব বললেন– দৌলতমান্দ আমরা যেমন নই, তেমনই খুবই দীনও আমরা নই জনাব। তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কেন, একশ' জনের মেহমানদারী করার সামর্থও আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং দ্বিমত করার সুযোগ নেই জনাব। যে কয়দিন আপনারা এখানে আছেন, আমাদের মেহমান হয়েই থাকতে হবে?

শাহ সুলতান সাহেব বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন– ইমাম সাহেব!

ইমাম সাহেব ফের বললেন– আপনাদের মতো মেহমানদের মেহমানদারী করাটা মস্তবড় সওয়াবের কাজ। দয়া করে এই খোশ কিসমতি থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

ইমাম সাহেবের সাথে সকলেই নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন। অবশেষে সাব্যস্ত হলো– সকলেই এই মেহমানদারীতে অংশ গ্রহণ করবেন। মেহমানদারী হিসাবে সকলেই অর্থ দেবেন ইমাম সাহেবের হাতে। রাজা বাহাদুর আর তাঁর সঙ্গী পীর সাহেব, ইমাম সাহেবের মকানেই থাকবেন। তাঁদের খাওয়া থাকা ইমাম সাহেবের বাড়িতেই হবে। জাহাজে যাঁরা আছে, তাঁরা জাহাজেই থাকবেন। তাঁদের খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা এখানকার এই মুসলমানদের অর্থেই হবে। সুফী সাহেবের অর্থে নয়।

সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়ে গেল। শাহ সুলতান সাহেব আর আমি ইমাম সাহেবের গৃহেই রয়ে গেলাম।

ইমাম সাহেবের মকানে বেশ কয়েকদিন গল্প আলাপে আর শুয়ে বসে কেটে গেল। এরপর নামাজ অন্তে একদিন শাহ সুলতান সাহেব ইমাম সাহেবকে বললেন– মুরুব্বী! এবার আমাদের উঠতে হয়। অযথা কালক্ষেপণ না করে যে কাজে এসেছি আমরা সেই কাজে নেমে পড়ি।

ইমাম সাহেব বললেন– সেই কাজে মানে ইসলামের খেদমতে? ইসলাম প্রচারের কাজে?

: জি জি। ইসলামের আলো জ্বালাতেই আমরা এখানে এসেছি। এযাযত দিন, আর বসে না থেকে আমরা মাঠে নেমে পড়ি।

: অবশ্যই অবশ্যই। সৎকাজে বিলম্ব করা উচিত নয়। তা কোথায় সে আলো জ্বালাতে চান? এই চট্টগ্রামে?

: জি। এখানে কি সর্বত্রই সে আলো জ্বালানো হয়ে গেছে?

: হয়ে গেছে মানে! কি করে হবে? নিজ গরজে কেউ না জ্বালালে আপছে আপ সে আলো জ্বলবে কি করে?

: মুরুব্বী!

: এই আমরা ক'জন মুসলমান এখানে আছি বলেই কি চট্টগ্রামের সর্বত্রই ইসলামের আলো পৌঁছে গেছে? হেথা হোথা আরো দু'চার জনের কাছে পৌঁছে থাকলেও, চট্টগ্রামের বিশাল এলাকাটা এখনও প্রায় সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জনাব।

: তার অর্থ, এখানে ইসলাম প্রচারের দরকার আছে, না কি বলেন?

: জি, অবশ্যই আছে।

: সে জন্যেই আমরা এখন এখানে কাজ শুরু করতে চাই।

: জি জি, করুন করুন...

একটু থেমে ইমাম সাহেব ফের বললেন– তবে...

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– তবে?

: একটা কথা বলতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন।

: আরে, বলুন বলুন। মনে করবো কেন? আপনার কোন কথাতেই আমি কিছু মনে করবো না।

Boighar & BABD
: বলছিলাম কি, এই চট্টগ্রামটাই সম্পূর্ণ বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশের এক প্রান্তের এক ভূখণ্ড মাত্র। মূল বাংলাদেশ আছে এখান থেকে অনেক যোজন দূরে। মূল বাংলাদেশের তুলনায় এই চট্টগ্রাম একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, অর্থাৎ ক্ষুদ্র এলাকা। মূল বাংলাদেশ একটি বিশাল ভূখণ্ড, মানে একটি বিশাল এলাকা। তাই বলছিলাম কি...

: বলুন বলুন।

: এই চট্টগ্রামে ইসলামের আলো যখন কিছুটা হলেও জ্বলেছে, তখন আল্লাহর রহমে এই আলোর মাধ্যমেই একদিন সমগ্র চট্টগ্রাম দীন ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু...

: কিন্তু?

: মূল বাংলাদেশ আছে গোমরাহীর অতল তলে তলিয়ে। ইসলামের আলো সেখানে জ্বলেনি। এই সুদূর চট্টগ্রাম থেকে দীন ইসলামের আলো সেখানে গিয়ে কবে পৌঁছবে বা আদৌ পৌঁছবে কি না, সেটা একমাত্র রহমানুর রহিমই জানেন। তাই বলছিলাম...

: আহহা, বলুন বলুন। এত ইতস্তত করছেন কেন?

: বলছিলাম, আপনারা যদি তকলিফ মনে না করেন, তাহলে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার চট্টগ্রামে আমরা যারা মুসলমান আছি, তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আপনারা মূল বাংলাদেশের একদম অভ্যন্তরে চলে যান। সেখানে গিয়ে, যতদূর পারেন, কিছু কিছু স্থানে দীন ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করে গেলে ঐ আলোর স্পর্শেই ইনশাআল্লাহ সমগ্র বাংলাদেশ একদিন ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে। নইলে সেখানকার অন্ধকার দূরীভূত হওয়া সুদূর পরাহত ব্যাপার হয়েই থাকবে।

শাহ সুলতান সাহেব এ কথায় অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠে বললেন– মা'শাআল্লাহ! বড় কায়েমী কথা বলেছেন তো জনাব। ঐ ঘোর অন্ধকার স্থানে আলো জ্বালানোই তো হবে আমাদের প্রকৃত কাজ আর আমাদের অশেষ সওয়াব কামানোর সুযোগ। আমাদের দীক্ষাগুরু দামেশকের শেখ তওফিক সাহেবের নির্দেশই ছিল– বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচার করা; বাংলাদেশের কোন প্রান্তে বা কিনারে নয়।

ইমাম সাহেব বললেন– সাব্বাস! তাহলে তাই করুন জনাব। আপনারা এখানে কালক্ষয় না করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাত্রা করুন আর ঐ প্রত্যন্ত এলাকায় ইসলামের আদর্শ ছড়িয়ে দিয়ে আসুন।

Boighar & BABD

: তাই যাবো জনাব, তাই যাবো। কিন্তু...

থেমে গেলেন শাহ সুলতান সাহেব। ইমাম সাহেব বললেন– কিন্তু? কিন্তু কি জনাব?

: সৈন্য সামন্ত নিয়ে এত লোক আমরা। জাহাজ এখানে রেখে আমরা এত লোক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাবো কি করে?

: সে কি! জাহাজ এখানে রেখে যাবেন কেন? জাহাজ নিয়ে যাবেন।

: জাহাজ কি যাবে সবখানে?

www.boighar.com

: যাবে জনাব, সর্বত্রই যাবে। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। এ দেশের সর্বত্রই খরস্রোতা বিশাল বিশাল নদী প্রবাহিত। যেখানে যেতে চাইবেন, সেখানেই যেতে পারবেন।

: আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে আর কথা নেই!

শাহ সুলতান সাহেব পুলকিত হয়ে উঠলেন। ইমাম সাহেব বললেন– একটা প্রশ্ন করবো করবো করে করাই হয়নি। এত সৈন্য সামন্ত সাথে রেখেছেন কেন জনাব? নিশ্চয়ই শক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের জন্যে নয়? নিশ্চয়ই নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে?

শাহ সুলতান সাহেব হাসিমুখে বললেন– আপনি দানেশমান্দ লোক জনাব। সবই বোঝেন। শক্তির দ্বারা ইসলাম প্রচার হয় না। সেটা জুলুম করা হয় আর আল্লাহ তায়ালা তা বরদাশত করেন না। সৈন্যবাহিনী সাথে এনেছি শুধুই আমাদের আত্মরক্ষার জন্যে। বিদেশ বিভূইয়ে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কখন কোন বিপদে পড়ি আমরা; স্বদেশীদের ইসলাম কবুল করতে অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হতে দেখলে, কোন শক্তি কখন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই বিবেচনায় সৈন্যবাহিনী সঙ্গে আনতে হয়েছে।

: বহুত খুব, বহুত খুব। আপনারাও বহুত বহুত দানেশমান্দ লোক জনাব। প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হোন।

: এবার তাহলে এযাযত দিন জনাব, আমরা এবার আসি...

: আসুন।

: আল্লাহ হাফেজ...

: আল্লাহ হাফেজ!

০ ০ ০

বলেই চললেন হাজী খলিল পীর আর শুনতে লাগলো গুরুদাস। খলিল পীর সাহেব এরপর বললেন– আমাকে, ফৌজদার নূর মুহম্মদকে তাঁর সৈন্যদের ও জাহাজের অন্যান্য সকল লোকজনকে নিয়ে শাহ সুলতান সাহেব এবার চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে দিলেন জাহাজ। অতঃপর জাহাজ যোগে আমরা সন্দ্বীপের মধ্য দিয়ে একটানা চলে এলাম বাখরগঞ্জ জেলার হরিনাম নগরে। হরিরাম নগরের রাজা ছিলেন অত্যাচারী কালীপূজক বলরাম। রাজা বলরামের জুলুমে আর অমানুষিক নির্যাতনে প্রজাকূল অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। জমিজমার খাজনার সাথে রাজার কালীপূজার খরচ যোগাতে নাভিশ্বাস উঠেছিল প্রজাকূলের। উল্লেখ্য, রাজার মন্ত্রী ছিলেন জ্ঞানবান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। প্রজার উপর রাজার এই জুলুম মন্ত্রীকে পীড়া দিতো।

একটু থেমে পীর সাহেব দম নিতে লাগলেন। তা দেখে মাথা তুললো গুরুদাস। বললো– তারপর কি হলো হুজুর?

আবার শুরু করলেন খলিল পীর সাহেব। বললেন– রাজার এই জুলুমের আর প্রজাদের দুর্দশার খবর শুনে শাহ সুলতান সাহেব হরিরাম নগরের সদরঘাটে জাহাজ নোঙর করালেন। ঘাটে জাহাজ ভেড়ানোর সাথে সাথে দলে দলে নারী-পুরুষ ছুটে আসতে লাগলো এই অদভুত জাহাজটি দেখার জন্যে। জনগণের মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেল, সদরঘাটে বিশাল এক মাছ জেগে উঠেছে। জনগণ ছুটে এসে মাছ দেখতে না পেলেও মাছের আকৃতির এই বিশাল জাহাজ দেখে যার পর নেই তাজ্জব হয়ে গেল তারা। সকলে ভিড় করে দেখতে লাগলো জাহাজটি।

এই সময় শাহ সুলতান সাহেব বেরিয়ে এলেন জাহাজ থেকে। তিনি এসে ঘাটে নামতেই লোকজন সব চমকে উঠে বললো– ওরে বাপরে! কি কাণ্ড শুরু হয়েছে এখানে! এখানে আবার স্বয়ং দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। দেখছো দেহের কি জ্যোতি! আর বরণ!! পালাও পালাও...

– বলেই সকলে দৌড়ে পালাতে উদ্যত হলো। শাহ সুলতান সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে ও হাসিমুখে বললেন– এই যে ভাই ও বোনেরা! মানে দাদা আর দিদিরা, আমি মানুষ, মানুষ! কোন দেবদেবী নই। আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দয়া করে আপনারা যাবেন না।

শাহ সুলতান সাহেবের এ কথায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল লোকজন। তারা বলাবলি করতে লাগলো– ওরে দাদা, ইনি তো মানুষ দেখছি। মানুষের মতোই তো কথা বলছেন।

Boighar & BARD
শাহ সুলতান সাহেব ফের বললেন– হ্যাঁ দাদা-দিদিরা, আমি মানুষ। আপনাদের মতোই সাধারণ মানুষ। আপনারা যাবেন না, দয়া করে দাঁড়ান। আমি আপনাদের সাথে দুটো কথা বলতে চাই...

এবার কয়েক জন বললো– কি আশ্চর্য! ইনি আমাদের আপনি আপনি করছেন আর কি বিনয়ের সাথে কথা বলছেন। এমনটি তো ভাবাই যায় না। ও সদানন্দ বাবা, আপনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন না, উনি কি বলতে চান? খুব মহৎ লোক বলে মনে হচ্ছে। সাহস করে যান না এগিয়ে?

এই সদানন্দ বাবু লোকটি একজন প্রৌঢ় লোক। তার পোশাক পরিচ্ছদও কিছুটা ছিমছাম। তিনি বললেন– যাচ্ছি যাচ্ছি। এতটা বিনয়ী আর মিষ্টভাষী যে লোক, তাঁর কথা তো শোনাই উচিত।

সামনে এগিয়ে এসে সদানন্দ বাবু বললেন– দোহাই দাদা, আমাকে প্রভু বলে লজ্জা দেবেন না। বললাম তো, আপনাদের মতোই আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনি আমাকে আপনাদের এক ভাই মনে করতে পারেন।

: ভাই? হায় ভগবান! কে আপনি?

: আমি একজন পরিব্রাজক দাদা। একজন ভ্রমণকারী।

: ভ্রমণকারী? এখানে ভ্রমণ করতে এসেছেন?

: হ্যাঁ দাদা। এক্ষণে আমি আপনাদের একজন অতিথি।

: জয় গুরু! অতিথি নারায়ণ। আমাদের দেবতা। বলুন দাদা, কি জানতে এসেছেন?

: জানতে এসেছি মানে, আপনাদের ভালমন্দের খবর নিতে এসেছি। কি হালে আছেন আপনারা, ইহকাল পরকাল নিয়ে কি ভাবছেন– এই সব বিষয় জানতে আমি বড়ই আগ্রহী। এই সব জানার জন্যে এসেছি।

সদানন্দ বাবু এবার মলিনকণ্ঠে বললেন– আমাদের আর ইহকাল পরকাল দাদা। অন্ধের যেমন রাত দিন সমান, আমাদের ইহকাল পরকাল তেমনি সমান দাদা। সমান অন্ধকারময়।

: অন্ধকারময়? কেন কেন?

: পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই, অথচ আছে অমানুষিক জুলুম।

: জুলুম! কে করে জুলুম?

: আমাদের রাজা দাদা, আমাদের নিষ্ঠুর রাজা। অথচ একথা তাঁর কানে গেলেও আমাদের মরণ!

: সদানন্দ বাবু!

: রাজার অর্থের যোগান দিতে দিতে আমাদের প্রাণান্ত অবস্থা। দুই বেলা আমাদের আহারই জোটে না।

: তা রাজাকে সে কথা বলেন না কেন আপনারা?

: রাজাকে? ওরে বাপরে! শত অত্যাচারের মুখেও আমরা হাসিমুখে 'সুখে আছি' না বললে, জান আমাদের থাকবে? চাবুকের পর চাবুক মেরে আমাদের পিঠের চামরা তুলে দেবে!

: বলেন কি?

: জুতা পেটা করবে দাদা। জুতা মেরে আমাদের মাথার খুলি ফাটিয়ে দেবে।

: তাজ্জব! এর প্রতিকার কিছু নেই?

: প্রতিকার? কি প্রতিকার থাকবে দাদা। আমরা তো দুর্বল, অসহায়, শক্তিহীন। মা কালীর পায়ে দু'বেলা মাথা ঠুকছি, তবু তিনি কিছু করছেন না। কি প্রতিকার থাকবে আমাদের দাদা?

: মা কালী! মা কালী কে?

: আমাদের ইহকাল পরকালের মালিক। তিনিই তো ইহকাল পরকালের সর্বময় কর্তা। তাঁর পূজার এত খরচ যোগাচ্ছি, তবু আমাদের প্রতি দয়া হচ্ছে না কালী মাতার। পায়ে পাথা কুটে কুটে কপালের ছাল তুলে ফেললাম দাদা!

: সে কি! সেই কালী মাতা আপনাদের সব সময় দেখা দেন? আপনাদের কাছে স্বশরীরে আসেন?

: তা আসবে কেন? উনি কি কখনো আসেন?

: তাহলে? আপনারা তাহলে মাথা কুটলেন কার পায়ে আর কোথায়?

: ঐ কালী মন্দিরে। মন্দিরে মূর্তি আছে কালী মাতার। ঐ মূর্তির পায়ে দুই বেলা মাথা ঠুকি দাদা, তবু মায়ের দয়া হয় না।

: মূর্তি! ঐ মূর্তির কি প্রাণ আছে?

: প্রাণ! প্রাণ থাকবে কি করে? ওটা তো খড়মাটির তৈরি মূর্তি দাদা! ওর কি প্রাণ থাকে?

: ঐ মূর্তি আপনারাই বানান, তাই নয়?

: হ্যাঁ আমরাই তো বানাই।

: তবু আপনাদের বানানো ঐ নিস্প্রাণ মূর্তির পায়ে মাথা কুটেন আপনারা?

: তাইতো কুটি!

Boighar & BABD

: এটা শেরেকী। পুণ্য তো নয়ই, এতে চরম পাপ হচ্ছে আপনাদের। যিনি আসল ভগবান, তিনি রুষ্ট হবেন এতে।

: দাদা!

: আসল ভগবান বাদ দিয়ে মাটির মূর্তিকে আপনার ভগবান বানিয়ে বসে আছেন। ভগবানের এতে রাগ হবে না?

: বলেন কি! আপনারা তাহলে কার পূজা করেন দাদা?

: আমরা পূজা করি না। আমরা হিন্দু নই, মুসলমান। আমরা ইবাদত করি। আরাধনা করি। আমাদের কোন দেবদেবী নেই। আছে একমাত্র আল্লাহ। আপনাদের ভগবান আর আমাদের আল্লাহ। শুধু নামের প্রভেদ।

: দাদা!

: আল্লাহ বা ভগবানের কোন আকার নেই। তাঁকে দেখা যায় না।

: তাহলে আরাধনা করেন কি করে? আল্লাহ যে আছেন তা জানলেন কি করে?

: আল্লাহর রসূলের অর্থাৎ তাঁর দূত বা প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে জেনেছি। ঐ রসূলের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার পবিত্র গ্রন্থ পাক কোরআন পেয়েছি, ঐ গ্রন্থ পড়ে জেনেছি।

: আমাদেরও তো বেদ পুরান গ্রন্থে দেবদেবীর কথা আছে দাদা। তাঁরাই যে আমাদের ভগবান, সেই কথা আছে।

: সে কথা ঠিক নয়। কারণ, আপনাদের বেদ পুরান মানুষের তৈরি গ্রন্থ। কিছু সুবিধাবাদী লোক তাদের সুবিধার জন্যে ঐ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা কি সকলেই সমান? সব মানুষ সমান আপনারা?

: রাম রাম! তা হবো কি করে দাদা। আমরা কিছু সংখ্যক সাধারণ লোকেরা শূদ্র। শূদ্রের উপরে আছেন বৈশ্য। শূদ্র আর বৈশ্যের মাথার উপরে আছেন ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ। তাঁরা আমাদের অর্থাৎ বৈশ্য আর শূদ্রের পরম পূজনীয় লোক। আমরা তাঁদের পাদুকার তলের লোক দাদা। সমান হবো কি করে। তাঁদের পূজা করা তথা খেদমত করাই আমাদের কাজ।

: পূজা!

: মানে তাঁদের সুখ-শান্তির খরচ যোগানো আর তাঁদের সুখ-শান্তির জন্যে শ্রম দেয়াই আমাদের কাজ।

: এই জন্যেই আপনাদের শাস্ত্রকারেরা এই বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। এই সুবিধা ভোগ করার জন্যেই এই শ্রেণীর সৃষ্টি করেছেন।

: আপনাদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই? কোন ছোট বড় নেই?

Boighar & BABD
: না। আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলামে কোন ছোট বড় নেই। রাজা ভিক্ষুক সবাই সমান।

: বলেন কি দাদা! একি অসম্ভব কথা বলছেন?

: মোটেই অসম্ভব নয়। রাজা ফকির সবাই আমরা এক সারিতে বসে আহার করি, এক সারিতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করি। মানে নামাজ পড়ি।

: দাদা!

: যদি কোন ফকির বা মিসকিন নামাজের ইমাম, মানে পুরোহিত হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যান, তাহলে রাজা কেন, গোটা বিশ্বের সম্রাটও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে, তাঁর পেছনে মাথা ঠেকিয়ে সেজদা দেবে– এটাই ইসলামের ধরাবাঁধা বিধান। যে আপত্তি করবে সে ইসলাম থেকে খারিজ।

: কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! এমন নিয়ম?

: ধনবানেরা তাদের ধন-সম্পদের নির্দিষ্ট এক অংশ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে– এটাও দীন ইসলামের আর একটা অপরিহার্য নিয়ম।

সদানন্দ বাবু এবার মহানন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন– চলুন দাদা, আমাদের বস্তিতে, মানে গ্রামের মধ্যে চলুন। আপনার এই মহান বাণী আমাদের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও গরীব-দুঃখী নর-নারীর মধ্যে বর্ণনা করুন। শুনলে তারা খুশি হবেন। দুঃখের মধ্যেও তারা কিছুটা শান্তির পরশ পাবেন। এই নিকটেই আমাদের গ্রাম। চলুন দাদা, দয়া করে চলুন...

উপস্থিত সকলেই বললো– চলুন, চলুন...

শাহ সুলতান সাহেব এবার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন– হাজী খলিল পীর সাহেব, আসুন...

জনগণের অনুরোধে সৈন্যবাহিনীসহ সবাইকে জাহাজে রেখে শাহ সুলতান সাহেব আমাকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন। গ্রামটা সত্যিই খুব নিকটে হওয়ায় আমরা নিমেষেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

গ্রামে যাওয়ার সাথে সাথে শাহ সুলতান সাহেবের অপরূপ রূপ অর্থাৎ হিন্দুদের দেবমূর্তি প্রতীম সৌন্দর্য দেখে গ্রামের সব লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। খবর গেল আশপাশের গ্রামগুলোতেও। এরপর তিনি যখন বক্তব্য শুরু করলেন তখন শুধু আশপাশের গ্রামগুলোর লোকই নয়, খবর পেয়ে দূর-দূরান্তের গ্রামবাসীরাও ছুটে এলেন শাহ সুলতান সাহেবকে স্বচক্ষে দেখতে আর তাঁর বক্তব্য নিজ কানে শোনতে। অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে আর সুমিষ্ট ভাষায় ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে লাগলেন শাহ সুলতান সাহেব। মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন

Boighar & BARD

ঐ এলাকার অগণিত হিন্দু নরনারী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁরা ঘিরে রইলেন শাহ সুলতান সাহেবকে। শাহ সুলতান সাহেব নিজের হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে ক্রমে ক্রমে তাঁদের হৃদয়ের বরফ গলিয়ে ফেললেন। ফলে ঐ অগণিত জনতা এক সাথে আওয়াজ তুললো– জয় গুরু জয় গুরু! জয় প্রভু জয় প্রভু! আমাদের ভুল ভেঙ্গে গেছে।

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– অর্থাৎ?

অগণিত জনতা ফের একসাথে বললো– এত সুন্দর ধর্ম আর এত সুন্দর ধর্মীয় ব্যবস্থা থাকতে আর আমরা ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ থাকবো না। আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। আমরা মুসলমান হবো।

: মুসলমান হবেন?

: জি হুজুর। আমাদের মুসলমান করে নিন হুজুর। এখনই আমাদের মুসলমান করে নিন। আমরা মুসলমান হবো।

: বেশ ভাল কথা। কিন্তু এত তাড়াহুড়া না করে আপনারা আর একটু ভেবে দেখুন। মনের কোণে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে কি না, আর একটু ভেবে দেখুন।

এবার একজন গ্রাম্য মাতবর সোচ্চারকণ্ঠে বললেন– আমাদের ভেবে দেখা হয়ে গেছে হুজুর। আর ভেবে দেখার কিছু নেই। আপনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন।

মাতবরটি সদানন্দ বাবুর অর্থাৎ সদানন্দ সেনের প্রতিবেশী। তার কথার প্রতিবাদ করে সদাসন্দ সেনও সোচ্চারকণ্ঠে বললেন– না, ভেবে দেখার যথেষ্ট আছে।

মাতবরটি নাখোশকণ্ঠে বললেন– আছে?

সদানন্দ সেন বললেন– হ্যাঁ আছে। অবশ্যই আছে। আমাদের মুসলমান হওয়ার খবর ঐ নিষ্ঠুর রাজা বলরামের কানে গেলে আমাদের কি দশা হবে, তা কি ভেবে দেখছেন? রাজা আমাদের সবাইকে কচু কাটা করবেন।

মাতবরটি তবু দীপ্তকণ্ঠে বললেন– মরতে হয় মরবো। মিথ্যার আঁধার থেকে বেরিয়ে সত্যের আলোতে এসে মরবো। তাতে হয়তো পরম করুণাময় ভুল মার্জনা করে পরলোকে আমাদের শান্তি বিধান করতেও পারেন।

সদানন্দ বাবু থমকে গিয়ে বললেন– কিন্তু...!

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক বললেন– মরণকে এত ভয় আপনার সদানন্দ বাবু? আপনি কি চান না, মিথ্যা পথ ত্যাগ করে সত্য পথ গ্রহণ করতে?

সদানন্দ সেন এবার সশব্দে বললেন– চাই চাই। আপনাদের সকলের আগে আমি ইসলাম কবুল করতে চাই। কিন্তু ভাবছি, অসহায়ের মতো শুধু প্রাণটাই

Boighar & BABD
আমাদের যাবে। রাজার আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি আমাদের নেই। সে শক্তি আমরা পাবো কোথায়?

জনতার ভিড়ের মধ্যে থেকে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ এলো– আমি দেবো।

ভিড় ঠেলে আপাদমস্তক চাদরে আবৃত এক ব্যক্তি বীর দর্পে সামনে এগিয়ে এলেন এবং দীপ্তকণ্ঠে বললেন– আমি আছি আপনাদের সাথে। আমি দেবো সে শক্তি। রুখে দাঁড়াবো রাজার বিরুদ্ধে।

চাদরের আবরণ খুলে ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অগণিত মানুষ চমকে উঠে বললেন– একি! স্বয়ং মন্ত্রী বাহাদুর যে! আপনি?

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন– সবার আগে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো।

এবার শাহ সুলতান সাহেব স্তম্ভিতকণ্ঠে বললেন– সেকি জনাব! আপনি? আপনি ইসলাম কবুল করবেন?

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন– জি হ্যাঁ মহানুভব। সবার আগে আমি ইসলাম কবুল করবো। প্রথম থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু আপনি বলেছেন, সব আমি শুনেছি।

সদানন্দ সেন উদগ্রীবকণ্ঠে বললেন– কিভাবে প্রভু, কিভাবে?

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন– আমি কার্যোপলক্ষ্যে এদিকে এসেছিলাম। সদরঘাটে অদ্ভূত একটি জাহাজ ভেড়ানো দেখে ঘাটে চলে এলাম। এসেই আমি দেবতুল্য সৌন্দর্যের অধিকারী এই মহান আগন্তুককে দেখলাম আর তাঁর বক্তব্য আমার কানে পড়লো। তখনই আমি গায়ের চাদর দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেললাম আর আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মহাপুরুষের বক্তব্য শুনতে লাগলাম।

সদানন্দ সেন বললেন– তারপর প্রভু?

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন– তারপর আমি আত্মগোপন করে আপনাদের পেছনে পেছনে এলাম আর ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে এই মহোদয়ের বক্তব্য শুনতে লাগলাম।

: হুজুর!

www.boighar.com

: আপনাদের উপর রাজার অমানুষিক জুলুম আর অকথিত নির্যাতন আমাকে বরাবরই পীড়া দিতো। কিভাবে আপনাদের আমি রক্ষা করতে পারি, কিভাবে রাজার জুলুমের প্রতিকার করতে পারি– একথা আমি সব সময় ভাবতাম। আজ এই মহোদয়ের সমস্ত কথা শুনে আমি সত্যের সন্ধান পেলাম আর পেলাম রাজার জুলুমের প্রতিকারের পথ।

: হুজুর!

: আপনাদের কোন ভয় নেই। রাজার হামলার বিরুদ্ধে আমি রুখে দাঁড়াবো। আপনারাও সাথে থাকবেন আমার।

: সাথে আমরা অবশ্যই থাকবো। কিন্তু তা থেকে কি আমরা রাজার সশস্ত্র বাহিনীর সাথে পারবো?

: পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় অবশ্যই আমরা পারবো। রাজার ঐ সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় অর্ধেকটাই আমার অনুগত। রণক্ষেত্রে আমার ইশারা পাওয়া মাত্র তারা রাজার পক্ষ ত্যাগ করে এসে আমার পক্ষ নেবে। কাজেই, আমরা যদি একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াই, আমার অনুগত ঐ সশস্ত্র লোকের সাহায্যে অবশ্যই রাজাকে আমরা পরাভূত করতে সক্ষম হবো।

: পারবো প্রভু?

এবার শাহ সুলতান সাহেব বললেন– অবশ্যই পারবেন। আমিও যোগ দেবো ঐ লড়াইয়ে। আমার সাথে আছে একটি চৌকস সৈন্যবাহিনী। আমার বিশ্বাস, শুধু তাদের আক্রমণই প্রতিহত করার সাধ্য আপনাদের এই আঞ্চলিক রাজার নেই। এর সাথে আপনারা আর এই মন্ত্রী বাহাদুরের সেপাইরা যোগ দিলে, ঐ রাজা ফুৎকারে উড়ে যাবে। এক নিমেষ টিকে থাকতে পারবে না।

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন– কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! আপনার সাথে সৈন্য বাহিনী আছে?

: চৌকস এক বাহিনী আছে। এমন দক্ষ এই বাহিনী যে, এ বাহিনী নবাব বাদশাহর বাহিনীর সাথে টক্কর লড়তে সক্ষম।

: আপনি আমাদের সাথে থাকবেন জনাব?

: আপনাদের এই রাজাকে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমি এক পাও এখান থেকে নড়বো না।

সদানন্দ বাবু বললেন– জয় গুরু, জয় গুরু!

এরপর তিনি শাহ সুলতান সাহেবকে বললেন– নিন দাদা, এবার বিধিমতে আমাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নিন।

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন– আমাকে সবার আগে ইসলাম কবুল করান জনাব। বিধিমতে আমাকে আগে মুসলমান করে নিন।

সকলের বিপুল চাপের মুখে শাহ সুলতান সাহেব আমাকে বললেন– এই যে আলহাজ খলিল পীর সাহেব, এই সব নিয়ম-কানুন আমার চেয়ে আপনারই জানা আছে বেশি। আপনিই এবার বিধান মতে এঁদের সবাইকে ইসলাম কবুল করান।

রাজার হুকুম তাজা। রাজা শাহ সুলতান সাহেবের হুকুমে আমিই এদের দলে দলে ইসলাম কবুল করালাম। ইসলাম কবুল করে সদানন্দ সেনের নতুন নাম হলো সদরউদ্দীন শাহ। মন্ত্রী বাহাদুরের নতুন নামের প্রশ্ন উঠলে শাহ সুলতান সাহেব বললেন– সে বিবেচনা পরে। 'মন্ত্রী বাহাদুর'কে আগে 'রাজাবাহাদুর' বানাই, তারপর তাঁর নামকরণ।

কথায় বলে, সরিষার মধ্যেও ভূত থাকে। এখানেও তাই ছিল। এই নির্যাতিত নিপীড়িত গ্রামবাসীদের মধ্যে অর্থাৎ প্রজাদের মধ্যে কয়েক জন বিশ্বাসঘাতক গ্রামবাসী ছিল। রাজার সুনজর পাওয়ার লোভে তারা তখনই গোপনে ছুটে গেল রাজার কাছে। রাজাকে তারা জানালো, 'শুধু বিপুল গ্রামবাসীই নয় প্রভু, আপনার মন্ত্রীও স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে।'

এর বেশি আর লাগে কি? রাজা বলরামের মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। 'জয় মা কালী' বলে উঠে দাঁড়িয়ে রাজা বলরাম হুংকার ছেড়ে বললো– খুন করবো। সবাইকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো!

সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে মার মার রবে ছুটে এলেন রাজা। কিন্তু মন্ত্রী বাহাদুর যা বললেন, তাই হলো। লড়াই শুরু হওয়ার আগেই রাজা বলরামের অর্ধেক সৈন্য চলে এলো মন্ত্রী বাহাদুরের পক্ষে। এরপর এই সৈন্যদের সাথে শাহ সুলতান সাহেবের বাহিনী যোগ দিলে হরিরাম নগরের রাজা এক পলকও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না লড়াইয়ে। মুহূর্তেই রাজা বলরাম নিহত হলেন। তাঁর সৈন্যেরাও অধিকাংশই নিহত হলো। বাদ বাকীরা কেউ পালিয়ে গেল, কেউ মন্ত্রী বাহাদুরের সাথে যোগ দিয়ে ইসলাম কবুল করলো।

অধিক বলা নিস্প্রয়োজন। অতঃপর শাহ সুলতান সাহেব মন্ত্রী বাহাদুরকে হরিরাম নগরের রাজ সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাজা বাহাদুর বানালেন এবং আনন্দিত দেশবাসীর ভূয়সী প্রশংসা লাভ করলেন।

অতঃপর এই নতুন রাজার অনুরোধে শাহ সুলতান সাহেব ও আমরা সবাই কয়েক দিনের জন্যে নতুন রাজার আতিথ্য গ্রহণ করে হরিরাম নগরেই রয়ে গেলাম।

৮

এদিকে সুরমা বিবি আর সুরতান সাহেবের এখনকার ব্যাপার স্যাপার হাজী খলিল পীর কিছু জানলেন না আর তাই সেসব কথা গুরুদাসকে কিছু বলতে পারলেন না। গুরুদাসকে তিনি শুধু আগের ঘটনাগুলোই বর্ণনা করে শুনাতে লাগলেন। অর্থাৎ শাহ সুলতান সাহেবের সাথে মাছের আকৃতি বিশিষ্ট জাহাজ যোগে এদেশে এসে যা যা ঘটেছিল সেই সব ঘটনাই বর্ণনা করে যেতে লাগলেন। বর্ণনা করতে করতে হরিরাম নগরের রাজা বলরামকে হত্যা করে তার মন্ত্রীকে রাজা বানানো এবং এই নতুন রাজার আতিথেয়তা গ্রহণ করা পর্যন্ত কাহিনী গুরুদাসকে শুনিয়ে নীরব হলেন খলিল পীর। অর্থাৎ তিনি বিশ্রাম নিতে লাগলেন।

বলাবাহুল্য, স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে শাহ সুলতান সাহেবের সুরমাদের বাড়িতে আসা, সেখানে থাকা ও 'সুরতান সাহেব' হয়ে যাওয়া এসব কিছু হাজী খলিল পীর আগে জানতেন না। গুরুদাসের মুখে শুনে জানলেন এবং গুরুদাসের অনুরোধে শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনী বর্ণনা করে গুরুদাসকে শুনাতে লাগলেন।

এদিকে নিত্য নতুন ঘটনা ঘটতে লাগলো সুরমাদের বাড়িতে। সুরমা বিবি হঠাৎ করেই শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। কয়েকদিন ধরেই অল্প অল্প তাপ উঠছিল তার শরীরে। সেই সাথে ছিল মাথা ধরা। হঠাৎ করেই জ্বর আর মাথা ধরা প্রকট হয়ে উঠলো। আর শয্যা নিলেন সুরমা বিবি। হেকিম কবিরাজ আনা হলো। তাবিজ পল্‌তে লাগানো হলো, শিকড় বাকলা পিষে গায়ে মাথায় মাখানো হলো, কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। কিছুতেই কিছু হলো না। মাথা ধরাটা কমলেও জ্বর উত্তরোত্তর বেড়েই চললো আর আহারের রুচি একদম চলে গেল।

মাঝে মাঝেই জ্বর এত বেশি উঠতে লাগলো যে, সুরমা বিবি কখনো কখনো অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলেন।

কাজের ঝি বিজলী বালাকে সাথে নিয়ে সুরতান সাহেব সুরমা বিবির মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন আর পানি ঢেলে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে লাগলেন। এই অবস্থা কয়েক দিন চলার পর জ্বর একটু কমে গেলে সুরমা বিবি সুরতান

Boighar & BARD
সাহেবকে বললেন– আর আমি বাঁচবো না গো। এভাবেই শেষ হয়ে যাবো আমি। এই শোয়াই শেষ শোয়া আমার। www.boighar.com

সুরতান সাহেব বললেন– কি বাজে বকছো? শেষ শোয়া হবে কেন? নিয়মিত ওষুধ খাও আর ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করো, সব অসুখ সেরে যাবে। খাওয়া দাওয়া যে ছেড়ে দিয়েছো একদম। খাওয়া দাওয়া করলে কবে অসুখ সেরে যেতো!

সুরমা বিবি বললো– কি করবো, খাওয়ার যে মোটেই রুচি হয় না।

: এভাবে না খেয়ে থাকলে যে মারা যাবে।

: আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে মারা আমি যাবোই। এবার আর উঠবো না।

: সুরমা!

: আপনার চিন্তা আপনি এবার করুন।

: আমার চিন্তা মানে?

: মানে, আমি মারা গেলে বউ লাগবে না আপনার? সে চিন্তা এখন থেকেই করুন।

: তার মানে? তুমি মারা গেলে শাদি করবো আবার?

: করবেন না? আজীবন একা একা থাকবেন?

: আরে রাখো এসব আজগুবি খেয়াল।

: আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, শাদি আপনাকে করতেই হবে।

: আল্লাহ না করুন, তেমন দিন এলে শাদি করার কি আর কোন প্রশ্ন থাকবে আমার?

: থাকবে না?

: না। নিজে শোয়ার জায়গা নেই, শংকরীকে কয়, মধ্যে শো। যত্তোসব!

: তার মানে?

: মানে? তুমি না থাকলে কি এ বাড়িতে আর থাকা চলবে আমার, না খরচের পয়সা কড়ি পাবো?

: পাবেন না?

: কি করে? তোমার বাপের পয়সার তুমি মালিক, আমি তো নই। আমাকে পয়সা দেবে কেন। আর তুমি না থাকলে এ বাড়িতে আমাকে থাকতে দেবে কে?

: এ কি বলছেন?

Boighar.& BABD

: বলছি, সে ক্ষেত্রে পথে পথে ঘুরে দিশে পাবো না আমি, আর আমি করবো শাদি! হুঁঃ!

: করবেন, করবেন। এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেও সুন্দরী মেয়েরা ধরে জোর করেই শাদি করবে আপনাকে।

: জোর করেই শাদি করবে আমাকে?

: তাই করবে।

: তাহলে এতদিন একশো এক গোন্ডা শাদি হতো আমার।

: কি রকম?

: তোমাদের এখানে আসার আগে পথে পথেই তো ঘুরে বেরিয়েছি এতদিন। কৈ, কোন মেয়েই তো জোর করে শাদি করেনি আমাকে? তোমার কথা ঠিক হলে তো হাজারটা শাদি হতো আমার।

: হয়নি মানে, রাস্তাঘাটে পড়ে থেকে থেকে চেহারাটা তখন আপনার বাদুর চোষা ছিল। তাই আপনাকে চোখে ধরেনি মেয়েদের।

: তার মানে, এখন চিকনাই ধরেছে আমার?

: ধরেছেই তো। কি সুন্দর রাজপুত্রের মতো চেহারা হয়েছে আপনার! আর আপনাকে ছেড়ে দেয় মেয়েরা?

: অর্থাৎ জোর করে ধরেই শাদি করবে আমাকে?

: করবে করবে। আমি দেখতে না পেলেও দশ জনে দেখবে।

এই সব ফালতু কথা বলতে বলতে দুই হাতে কপাল টিপতে লাগলেন সুরমা বিবি আর মৃদুস্বরে 'আহ! উহ্!' করতে লাগলেন। তা দেখে সুরতান সাহেব বললেন– কি হলো আবার?

সুরমা বিবি ক্লান্তকণ্ঠে বললেন– আজ সকাল থেকেই মাথা ধরাটা আবার বেড়ে গেছে। গা মাথা ঘুরছে। এর সাথে এখন আবার বমন বমন ভাব হচ্ছে। উঃ! খুব বেকায়দা হলো তো? –বলতে বলতেই গল গল করে বমন করে ফেললেন সুরমা বিবি।

বিজলী বালা এই সময় কাজ করছিলো বারান্দায়। বমনের শব্দ শুনে সে ছুটে এসে বললো– এহ্হে! একদম বিছানা বালিশ মাখিয়ে ফেলেছেন যে? দেখি দেখি, মাথাটা তুলুন...

বালিশ বদলে দিয়ে বিছানার বমন সাফ করলো বিজলী বালা। এরপর সে ঘর থেকে বেরুতেই আবার 'ওয়াক ওয়াক' করতে লাগলেন সুরমা বিবি। বিজলী

Boighar & BABD
বালা আবার ছুটে এসে বললো– ওহ্ হো! আবার তো বিছানা বালিশ মাখাবেন দেখছি... বলে বিজলী বালা সুরমা বিবিকে তুলে বিছানার উপর বসালো এবং বললো– বাইরে মুখ নিন দিদিমণি, বাইরে মুখ নিন।

বাইরে মুখ এনেই সুরমা বিবি আবার মেঝেতেই অল্প একটু বমন করে ফেললেন।

মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে সুরমার মা-বাবা এসে সুরমাকে দেখে গেলেন এবং ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে গেলেন। যাওয়ার সময় সুরমার মা বিজলী বালাকে বলে গেলেন– বিজলী, তুমি সব সময় সুরমার কাছে থাকবে। তোমাদের সংসারের কাজের জন্যে আমি আমাদের আর একজন ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এভাবেই কয়েক দিন চললো। এরপর সুরমা বিবির মাথাধরা আর জ্বর প্রায় সেরে গেল কিন্তু বেড়ে গেল তাঁর 'ওয়াক ওয়াক' শব্দ। বমন আসুক আর না আসুক, সুরমা বিবি প্রতিদিন বমন করার জন্যে 'ওয়াক ওয়াক' করতে করতে পুনঃ পুনঃ গোসলখানায় ছুটতে লাগলেন। তা দেখে সুরতান সাহেব বিজলী বালাকে বললেন– তোমার দিদিমণির এ কি হলো বিজলী বালা?

বিজলী বালা হাসিমুখে বললো– আপনি বাপ হতে চলেছেন দাদাবাবু, সন্তানের পিতা হতে চলেছেন।

: তার অর্থ?

: অর্থ বুঝলেন না? দিদিমণি অন্তঃসত্ত্বা। বাচ্চা এসেছে তাঁর পেটে।

দপ করে জ্বলে উঠলো সুরতান সাহেবের মুখমণ্ডল। তিনি খোশকণ্ঠে বললেন– সোবহান আল্লাহ! তুমি ঠিক বলছো?

বিজলী বালা বললো– আমার অনুমান ঠিক হলে, ঠিক বলছি।

ফের নিভে গেল আলো। সুরতান সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন– ও, এটা তোমার অনুমান? পুরোপুরি ঠিক খবর নয়!

বিজলী বালা গলায় জোর দিয়ে বললো– ঠিক খবরই দাদাবাবু, পুরোপুরি ঠিক খবরই এটা। বাচ্চা পেটে এলে মাস তিনেকের মাথায় প্রতিটি মেয়ে মানুষের এমন অবস্থাই হয়। আরো মাস কয়েক যাক, তখন দেখবেন, আমার কথা ঠিক কি না।

: বিজলী!

: মিষ্টি পাওনা রইলো দাদা বাবু। আমার কথা ঠিক হলে, আমাকে কিন্তু মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

: শুধু তোমাকে নয়, সেক্ষেত্রে তোমাকে আর অন্যান্য ঝি-চাকর সবাইকে পেট পুরে মিষ্টি খাওয়াবো।

খবর গেল সুরমা বিবির মায়ের কাছে। বিজলী বালাই গিয়ে পৌঁছে দিলো এ খবর। বললো– কত্তা মা, আপনি নাতীর মানুষ হোচ্ছেন। বাচ্চা এসেছে আপনার মেয়ের পেটে।

খবর শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন সুরমার মা। বিজলী বালাকে বললেন– তাই কি? সত্যি বলছো? কিন্তু সেদিন তো এমনটি মনে হলো না আমার? তুমি এ কথা বলছো কিসের জোরে?

বিজলী বালা বললো– লক্ষণ মিলে গেছে কত্তা মা। আমি যে সব জানি। তিন মাস হলো সুরমা দিদিমণির স্রাব হচ্ছে না। ওটা বন্ধ আছে। ঠিক তিন মাসের মাথায় এই মাথা ধরা, মাথা ঘুরা আর পুনঃ পুনঃ বমন করার ঘটনা ঘটে সব মেয়ের। আপনি তো সব কিছুই জানেন।

: তার মানে? সুরমার মাসিক বন্ধ আছে তিন মাস ধরে?

: আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা মা। তিন মাস ধরে বন্ধ আছে।

: জয় প্রভু, জয় প্রভু! দুই হাত জোড় করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন সুরমার মা।

: ভগবানের কৃপায় এবার একটা নাতী বা নাতনী আপনি পাচ্ছেনই কত্তা মা।

: তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বিজলী, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমার বংশ রক্ষা হওয়া যে বড়ই প্রয়োজন।

: কত্তা মা!

: বহু মানত মানসা করে তোমার ঐ সুরমা দিদিকে আমি পেয়েছি। আমাদের বংশে যে সন্তান আসে না কিছুতেই। এটি এলে হয় আর বেঁচে থাকলে হয়। বলেই 'জয় প্রভু, জয় প্রভু' বলে আবার কপালে দুই হাত ঠেকালেন সুরমার মা।

বিজলী বালা বললো– ভগবানকে ডাকুন কত্তা মা। তাঁর দয়ায় এবার আসছে আর বেঁচেও থাকবে।

: থাকুক থাকুক, হাজার বছরের আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকুক। তুমি এখন যাও বিজলী। সুরমাকে ফেলে বেশিক্ষণ বাইরে বাইরে থেকো না। কখন কি প্রয়োজন হয় তার সে সব দেখো গে, যাও...

বিজলী বালাকে বিদায় করে দিয়ে সুরমার মা তখনই চাকর হরিদাসকে ডাকলেন। হরিদাসকে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ এলাকায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ ধাত্রীকে অর্থাৎ দাইকে ডেকে আনালেন। তখনই দাই নিয়ে তিনি মেয়ের বাড়িতে ছুটলেন।

দাই এসে সুরমার বুক পেট ও চোখ মুখ নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করলো এবং পরীক্ষা অন্তে সুরমার মাকে হাসিমুখে বললো– হ্যাঁ গো কত্তা মা, ঘটনা ঠিক। আপনার মেয়ে সত্যি সত্যিই পোয়াতী। বাচ্চা এসেছে পেটে তার।

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সুরমার মা বললেন– ঠিক বলছো তো দাই মা? ঠিক বুঝতে পারছো তো?

দাই বললো– মানে?

সুরমার মা বললো– মানে, অনুমান করে বলছো না তো? বুঝতে কোন ভুল টুল হয়নি তো?

আর যান কোথায়? গালে হাত দিয়ে দাইমা বললো– মা গো মা! বলে কি গো মা! ভুল হবে আমার? দ্যাড় কুড়ি পোয়াতির বাচ্চা খোশালেম আমি, এক কুড়ি পোয়াতিকে শুরু থেকে আগাগোড়া দেখভাল করলাম, আর আমার ভুল হবে বুঝতে? কখ্খনো না, কখ্খনো না। আমার কথা আকাশের চাঁদ সুয্যির মতো বাস্তব কথা।

: দাই মা!

: সত্যি সত্যিই বাচ্চা এসেছে পেটে! মেয়ে আপনার গব্ববতী হয়েছে গো, গব্ববতী হয়েছে।

: জয় গুরু, জয় গুরু! তোমার কথাই যেন ঠিক হয় দাইমা!

: ঠিক হয় মানে? হতে বাধ্য। আমার কথা বেদ বাক্যের মতো অকাট্য কথা। তা দেখবেন বাপু, আমাকে বাদ দিয়ে কোন আনাড়ী দাই দিয়ে বাচ্চা খোশাবেন না যেন। তাহলে কিন্তু ভয়ানক বিপদ হতে পারে। চাই কি, বাচ্চা আর পোয়াতী দু'জনই...

সুরমার মা চমকে উঠে বললেন– থাক, থাক দাইমা, কোন অলুক্ষণে কথা মুখে এনো না বাপু! এমনিতেই বংশে আমার...

: সেই জন্যেই তো বলছি কত্তা মা। প্রসবের সময় আমাকে ডেকে আনবেন। এমনভাবে বাচ্চা খোশিয়ে দেবো যে, মেয়ে আপনার আদৌ টের পাবে না। কিছু বুঝে উঠার আগেই বাচ্চা খালাশ!

Boighar.BARD

: ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই হবে বাছা। নিরাপদে আর সুন্দরভাবে কাজ সারতে পারলে, পাওনার উপরও বকশিশ দেয়া হবে তোমাকে।

দাইমা খোশকণ্ঠে বললো– সে তো জানি গো, দেয়া থোয়াতে আপনারা বরাবরই অভ্যস্ত। তবে মোটা বকশিশ দিতে হবে গো কত্তা মা। পয়লা পোয়াতির বাচ্চা খোশানো বড় কঠিন কাজ। সেই কাজটিই সুন্দরভাবে করে দেবো আমি। বকশিশটা মোটা হওয়া চাই কিন্তু!

: তাই হবে, তাই হবে। এবার চলো...

: তা আমার সিদে? মানে এখনকার পাওনা?

: দেবো দেবো, আমার বাড়িতে চলো...

বাড়িতে এনে কুলাভর্তি চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ আর তরিতরকারী দিয়ে দাইকে বিদায় করলেন সুরমার মা। দাইকে বিদায় করে দিয়েই তিনি সুরমার বাপের কাছে ছুটলেন। সুরমার বাপ ঘরে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকেই সুরমার মা পুলক ভরে বললেন– ওগো মশাই, খবর কিছু জানেন? ওদিকের খবর?

সুরমার বাপ বললেন– খবর মানে? কিসের খবর?

সুরমা মা বললেন– খুশির খবর! খুশির খবর। মস্ত বড় খুশির খবর।

: খুশির খবর!

: আপনি নাতীর মানুষ হচ্ছেন গো। নাতী বা নাতনীর মানুষ। ঘর আলো করে নাতী বা নাতনী আসছে আপনার।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন সুরমার বাপ। বললেন– এ্যাঁ, তাই নাকি? আমার সুরমা মা...

: সুরমা মা, মা হতে চলেছে।

: জয় গুরু, জয় গুরু! খবর ঠিক তো?

: একদম ঠিক। দাই এনে দেখালাম। নেড়ে চেড়ে দেখে দাই দিব্যি দিয়ে বলে গেল এ কথা। এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন গো। বংশটা উদ্ধার হবে আমাদের এবার।

: আহ্। কি দারুণ খুশির খবর এনেছো তুমি গিন্নী। সত্যিই তাহলে বংশটা রক্ষা পাবে আমাদের।

: পাবে মানে কি? বংশ রক্ষে না হলে তো আমাদের এই সব বিষয় সম্পত্তি বারো ভূতে লুটে খাবে। কত দৌড় ঝাঁপ করে তবে আমি সুরমাকে পেয়েছি।

Boighar & BABD

সুরমা যদি আপছে আপ পেয়ে যায় সন্তান, তার চেয়ে বড় আনন্দের খবর আর কি কিছু হতে পারে?

: না না, এর চেয়ে বড় আনন্দের খবর আর কিছুই হতে পারে না। আহ! প্রাণটা আমার ভরে গেল গো। বাচ্চাটা একবার হোক, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবো আমি। আমার কাছে রাখবো।

: ওরে আমার রে! বাচ্চা হলে আপনাকে আমি দেবো? আমি আমার কাছে রাখবো।

: মেয়ে হলে তুমি তোমার কাছে রেখো। ছেলে হলে আমার কাছে থাকবে।

: সে গুড়ে বালি। ছেলে হলে মুসলমানের ছেলে মুসলমান হবে। মুসলমান বাপ ছেড়ে মুসলমান ছেলে হিন্দু নানার কাছে থাকবে কখনো?

: আর মেয়ে হলে বুঝি হিন্দু নানীর কাছে থাকবে?

: কেউ থাকবে না। যতই আমরা বলি, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, বাপ ছেড়ে কেউ আমাদের কাছে থাকবে না।

: থাকবে থাকবে। আমাদের কাছেই থাকবে।

: তার মানে? এটা আপনি জোর দিয়ে বলছেন কি করে?

: আরে, ঐ স্মৃতিভ্রষ্ট মুসলমানটা হঠাৎ করেই এখানে এসে জুটেছে। স্মৃতি ফিরে এলে তখন কি সে আর এখানে থাকবে? এদিকের সব কথা বেমালুম ভুলে যাবে সে আর ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। তখন তার সন্তান যাবে কোথায়? আমরা হিন্দু বলে কি সে আমাদের কাছে না এসে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?

: বালাই ষাট। তা ঘুরে বেড়াতে দেবো কেন আমরা। ধরে এনে আমাদের কাছে রাখবো।

: তবে? ওয়ারিশ না থাকলে আমার এত বড় বিষয় আশয় এত পয়সা কড়ি খাওয়ার কেউ থাকবে না। অথচ ওয়ারিশ থাকতে মুসলমান বলে তাকে দূরে ফেলে রাখবো আমি?

: ঠিক ঠিক। সেই আমাদের ওয়ারিশ। মুসলমান বাপটা এখানে থাক আর না থাক, তার সন্তানই আমাদের ওয়ারিশ। আমাদের কাছে না থেকে বাপ মায়ের কাছে থাকলেও সেই আমাদের বংশধর। সুরমার পরে আমাদের সব কিছু তারই হবে, না কি বলো?

Boighar & BABD

: একশো বার, একশো বার। সুরমার কোন বাচ্চা কাচ্চা না হলে তো লোপ পাবে আমাদের বংশটা। দোহাই ভগবান, এমন অভাগা যেন আমাদের করো না!

www.boighar.com

: সেইটেই বড় কথা গো, সেইটেই বড় কথা। এমনিতেই সুরমা মুসলমান হয়ে যাওয়ায় আড়ালে আবডালে কতজন কত কথা বলছে। তার উপর আবার মেয়ের বাচ্চা কাচ্চা না হলে পাড়ার কারো মুখে কি হাত দেয়া যাবে? আঁটকুড়ে বলে পাড়ার পাঁচজন মুখের উপর হাসাহাসি করবে আর দুর্নাম গেয়ে বেড়াবে।

: পাড়ার লোকেরা ঐ রকমই। অকৃতজ্ঞ আর অবিবেচক। পার হলেই পাটনি শালা!

: তা যা বলেছেন!

: মুসলমান হলেও পাড়ার কতবড় হিত করলো লোকটা, পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলো পাড়াটা, সে কথা কি মনে রাখবে কেউ? ভগবান মুখ না তুললে সে কথা কেউ মনে রাখবে না।

: সেটা এখনই বুঝতে পারছি। একমাত্র ভগবানই ভরসা।

: তাই তাই। থাক পাড়ার কথা। আমি একবার যাই...

সুরমার বাপ বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সুরমার মা বললেন– যাবেন মানে? কোথায় যাবেন?

: মেয়ের বাসায়। এত বড় সুখবর শুনার পর কি আর চুপ করে থাকা যায়?

: ছিঃ! আক্কেল নেই আপনার? মেয়ের পেটে বাচ্চা আসছে কি না, বাপ হয়ে জানতে যাবেন সে কথা? এতে লজ্জা পাবে না মেয়ে?

: এ্যাঁ! লজ্জা পাবে?

: অবশ্যই পাবে। বরং কিছুদিন পর অন্য কোন উপলক্ষে গিয়ে মেয়ের শরীরের অবস্থাটা একবার দেখে আসতে পারেন। কিন্তু মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে না, বুঝেছেন?

: তাই?

: হ্যাঁ, তাই। গাছ পাকলে হয় সার আর মানুষ পাকলে হয় বেসার। ধৈর্য ধরুন আর মনে মনে ভগবানের অনুগ্রহ কামনা করুন। এখনই এত অধৈর্য হবেন না।

: ঠিক আছে। তা হলে তাই হোক! হতাশ হয়ে সুরমার বাপ বিছানায় বসে পড়লেন আবার।

০ ০ ০

ঘরের বারান্দায় চৌকির উপর বসে থেকে সুরতান সাহেব কি যেন আকাশ পাতাল ভাবছিলেন। একেবারেই অন্য জগতে ছিলেন তিনি। এ সময় সুরমা বিবি এসে তাঁকে সপুলকে প্রশ্ন করলেন– কি গো, কিছু বুঝতে পারছেন?

এ জগতে ফিরে এসে সুরতান সাহেব বললেন– এ্যাঁ, কিছু বললে?

: হ্যাঁ, বললাম। কিছু বুঝতে পারছেন?

: কি বুঝতে পারবো?

: বাহ! এদিকে এত তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, তবু কিছু বুঝতে পারছেন না?

: তুলকালাম কাণ্ড মানে? কি কাণ্ড?

: বাব্বা! আপনি কোন জগতে আছেন গো? এই যে এ বাড়িতে বৈদ্য আসছে, কোবরেজ আসছে, আপনার শাশুড়ি আসছেন বার বার, সঙ্গে তাঁর দাই আসছে, ওষুধ আসছে, নতুন নতুন পথ্য আসছে– তবু কিছু বুঝতে পারছেন না?

: ও, এই কথা?

: এই কথা মানে? কোন কথা?

: ঐ যে বললে– বার বার আমার শাশুড়ি আসছেন, দাই আসছে, এই কথা।

: সেই কথাই তো বলছি। তবু কিছু বুঝতে পারছেন না? এতটাই অবোধ আপনি?

: পারছি। আলবত পারছি। দাই বৈদ্য আসার আগেই বুঝা আমার হয়ে গেছে। শ্রীমতি বিজলী বালা দেবী আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

: আচ্ছা। তা কি বুঝিয়ে দিয়েছেন?

: তোমার বাপ মায়েরা এ যাবত অপাত্রে ঘি ঢেলেছেন। এবার তাঁরা ঘি ঢালার যোগ্য পাত্র পেয়ে যাচ্ছেন।

: এত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলছেন কেন? কি বলছেন, সরাসরি বলুন।

: সরাসরিই তো বলছি। ঐ যে কথায় বলে, 'কোথাকার কে, লাঠি ঢুকে দে।' আমি তোমার বাপ মায়ের কোন আপনজন নই। উড়ো অপর মানুষ। অপর মানুষ হয়ে তোমার বাপের পয়সা ধুমছে খাচ্ছি আমি। অথচ এ পয়সার আমি কোন হকদার নই। যিনি সত্যিকারের হকদার...

Boighar & BABD
কথা শেষ করতে না দিয়ে সুরমা বিবি বললেন– আপনি কোন হকদার নন মানে? আপনি আপনার বউয়ের পয়সা খাচ্ছেন। আপনি কি আপনার বউয়ের পয়সার হকদার নন?

সুরতান সাহেব বললেন– হ্যাঁ, স্বামী হিসাবে হকদার। কিন্তু আসলে তো আমি তোমাদের বংশের কেউ নই। কোন রক্তের সম্পর্ক নেই।

: তার অর্থ?

: অর্থ, তোমার আর তোমার বাপের পয়সার যিনি আসল হকদার তিনি এবার আসছেন।

: এ্যাঁ! আপনি কার কথা বলছেন?

: তোমার পেটে যিনি ঢুকেছেন, আমি তার কথা বলছি।

: সোবহান আল্লাহ! বুঝতে পেরেছেন তাহলে?

: আলবত পেরেছি। তুমি মা হতে চলেছো আর তা করে তোমার বাপ মা তাঁদের পয়সা খাওয়ার আসল হকদার পেয়ে যাচ্ছেন।

: ফের উল্টাপাল্টা কথা? আসল হকদার মানে?

: মানে, তাঁদের যে পয়সা এ যাবত তাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসা লোক দিয়ে খাওয়াচ্ছেন, অতঃপর সে পয়সা তাঁদের আসল হকদার খাবে। তাঁদের বংশধর খাবে। অপাত্রে না পড়ে অতঃপর তাঁদের ঘি যোগ্য পাত্রে পড়বে।

: বাব্বা! এমনি হিংসে শুরু হয়ে গেছে? বুঝতে পারার সাথে সাথেই হিংসে জেগেছে মনে আপনার?

: তা যদি বলো, সত্যিই হিংসে জেগেছে মনে আমার।

: হায় সর্বনাশ! সে কি গো! আপন সন্তানের সাথে হিংসে?

: জব্বোর হিংসে। আপন সন্তান হলে কি হবে, আমার ভাগীদার পয়দা হয়ে যাচ্ছে। একান্তই আমার একার জিনিসে ভাগ বসাতে আসছে সে। আমার হিংসে হবে না?

: একান্তই একার জিনিস! কি আপনার একান্তই একার জিনিস?

: কি নয়, কে।

: কে?

: তুমি। তুমি আমার একান্তই একার জিনিস। এখন পর্যন্ত তাই আছো তুমি। আমিই তোমার ধ্যান, আমিই তোমার স্বপ্ন, আমিই তোমার অবলম্বন। সব সময়

Boighar & BABD

আমাকে ঘিরে আছো তুমি। অন্য কথায়, একেবারেই আমার একার জিনিস হয়ে আছো তুমি। সেই একার জিনিসের ভাগীদার পয়দা হতে যাচ্ছে। যে আসছে, সে আমার একার জিনিসে ভাগ বসাতে আসছে।

: ওমা, সেকি গো!

: সেইটেই সত্য কথা গো। আমি আর তোমার অবলম্বন থাকছিনে। তুমি তোমার আসল অবলম্বন পেয়ে যাচ্ছো।

: কি রকম?

: সন্তান কোলে এলে আমি কি আর তোমার অবলম্বন থাকবো? তখন সন্তানই হবে তোমার ধ্যান, তোমার স্বপন, তোমার সব। সন্তানকে ঘিরেই তোমার দিন রাত্রি কাটবে। আমাকে তোমার দু'একবার মনে পড়তেও পারে, নাও পারে।

: মানে! আপনার সাথে কোন সম্পর্কই আর থাকবে না আমার?

: থাকবে। স্বামী যখন হই, তখন দায়ে পড়ে আমার প্রতি তোমার কর্তব্যটুকু পালন করবে তুমি। কাজের ঝি বিজলী বালা যেমন নকরীর দায়ে আমার খেদমত করে, সেই রকম তুমিও স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করার দায়ে খেদমত করবে আমার। খেদমতটুকুর বাইরে বিজলী বালার কাছে আমি যেমন অপর লোক, তোমার কাছেও তেমনি অপর লোক হয়ে যাবো। পার্থক্য শুধু বিজলী বালাদের অন্তরের টান আদৌ থাকে না, তোমার সে টানটা কিছু কিছু থাকবে।

: মাগো মা! সেই চিন্তায় এখনই জান ছেড়ে দিচ্ছেন আপনি?

: চিন্তা কি আমার এইটেই শুধু? বাচ্চা কোলে এলে সব বউয়েরই অবলম্বন বদল হয়, আমার বউয়েরও হবে। সে চিন্তায় জান ছেড়ে দেয়ার তেমন কিছু নেই। কিন্তু আমার মনে আর একটা বড় চিন্তা ঢুকছে।

: বড় চিন্তা! কি নিয়ে সে চিন্তা?

: যে আসছে তার শাদি নিয়ে চিন্তা। যে আসছে সে নিরাপদে আসুক, আমাদের ঘর আলোকিত করুক, এ আনন্দে যেমন আমার মনটা ভরে উঠছে, সেই সাথে তেমনি তার শাদি নিয়ে চিন্তাটাও এখনই উঁকি মারছে আমার মনের কোণে।

: শাদি নিয়ে চিন্তা?

: হ্যাঁ, তার শাদিটা কেমন করে দেবো, সেই চিন্তা।

: কেমন করে দেবো মানে?

Boighar & BABD

: মানে, যে আসছে সে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, মুসলমানের সন্তান মুসলমান হবে। তাই ভাবছি, এই মুসলমানহীন নিখাদ হিন্দু এলাকায় তার শাদি দেবো কি করে?

: কেন, সমস্যাটা কোথায়?

: সমস্যা আছেও, আবার নাইও।

: আজব কথা! 'আছেও আবার নাইও'– এ কেমন কথা?

: যে আসছে সে মেয়ে হলে যথেষ্ট সমস্যা আছে। ছেলে হলে অবশ্য সমস্যাটা নেইও।

: কেমন কেমন?

: ছেলে হলে এই হিন্দু এলাকার কোন হিন্দু মেয়ে যদি তাকে শাদি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। হিন্দু সুরমা রানীর মুসলমান সুরতান সাহেবকে শাদি করার মতো সেই আগ্রহী হিন্দু মেয়ে মুসলমান হয়ে মুসলমান ছেলেকে শাদি করবে। কোন সমস্যা হবে না। সমস্যা শুধু মেয়ের বেলায়।

: মেয়ের বেলায় সমস্যা হবে?

: হ্যাঁ।

: কেন?

: কোন হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়েকে শাদি করতে চাইলেও, সে শাদি করতে পারবে না বা আমরা কোন হিন্দু ছেলের সাথে মেয়ের শাদি দিতে চাইলেও, শাদি দিতে পারবো না। কারণ আমাদের মুসলমান মেয়েকে হিন্দু করা যাবে না। অন্য কথায়, হিন্দুকে মুসলমান করা যায়, কোন মুসলমানকে হিন্দু করা যায় না।

সুরমা বিবি চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– ওম্মা! তাহলে উপায়? মেয়ে হলে আমার মেয়ের শাদিই হবে না?

সুরতান সাহেব বললেন– হবে। তবে আমাদের মন মতো হবে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাদি দিতে হবে।

: অর্থাৎ?

: তোমার বাপ মা যেমন মুসলমানের সাথে মেয়েকে শাদি দিয়েও মেয়েকে বাড়িতে আর চোখের সামনে রাখতে পেরেছেন, আমাদের বেলায় সেটি হবে না। আমাদের মেয়েকে শাদি দিয়ে চোখের সামনে রাখতে আমরা পারবো না। বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে আর অনেক দূরে পাঠাতে হবে।

Boighar & BABD

: অনেক দূরে কোথায়?

: যেখানে মুসলমান আছে সেখানে। শুনেছি, কিছু মুসলমান ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে এসে চট্টগ্রাম শহরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে আর সেখানে বসবাস করছে। খোঁজ করে তাদের ছেলেপুলের সাথে মেয়ের শাদি দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মেয়েকে বাড়ি থেকে বিদায় করে সেখানে পাঠাতে হবে। চোখের সামনে রাখার আর খোশ-কিসমতি হবে না।

সুরমা বিবি হতাশকণ্ঠে বললেন– ওম্মা! এ কি সর্বনেশে কথা!! আমি তাহলে কি নিয়ে থাকবো?

সুরতান সাহেব বললেন– সর্বনেশে হলেও আর উপায় নেই। নিজের মেয়েকে বিদায় করে দিয়ে, এই পরের ছেলে সুরতান সাহেবকে নিয়েই থাকতে হবে তোমাকে।

: পর?

: পর বৈ কি! আমি তো আসলেই তোমার পর। বিজলী বালার কাছে যেমন পর আমি, তোমার কাছে তেমনি আমি পর বৈ কি? শাদিটা হয়েছে বলেই যা সম্পর্ক! নইলে তুমিও আমার পর, আমিও তোমার পর।

এই সময় বিজলী বালা সেখানে এসে হাজির হলো এবং বললো– কে কার পর দাদাবাবু? কার কথা বলছেন?

সুরমা বিবি বললেন– আমার কথা। আমি নাকি তাঁর পর। তুমি যেমন তোমার দাদাবাবুর পর, আমিও নাকি তেমনি তাঁর পর।

: সে কি গো দিদিমণি! উনি আপনার স্বামী। পর ভাববেন কেন?

: স্বামীরা ঐ রকমই হয় বিজলী। তুমি তো কখনো স্বামীর ঘর করোনি। করলে বুঝতে স্বামীরা কেমন চিজ।

: দিদিমণি!

: মাথার চুল দিয়ে পায়ের পানি মুছে দিলেও স্বামীরা স্ত্রীকে আপন ভাবতে পারেন না। পরই ভাবেন চিরকাল।

সুরতান সাহেব কপট রোষে বললেন– এই খবরদার! বদনাম দেবে না আমাকে। আমি তোমাকে আমার চোখের মণি জ্ঞান করি, আর আমি আপন ভাবিনে তোমাকে?

সুরমা বিবি বললেন– ভাবেন না, হাতি! কথায় কথায় পর ভাবেন আমাকে আর বলছেন, আমাকে আপন ভাবে উনি!

বিজলী বালা বললো– ওহ্‌হো! আবার তো এঁরা ফালতু গোলমান শুরু করলেন! নিন নিন, উঠুন। পাক শাক শেষ। এবার যান, গোসল করে আসুন। দেরী করলে সব কিন্তু বরফ হয়ে যাবে।

সুরতান সাহেব বললেন– এ্যাঁ! বরফ হয়ে যাবে? কি গজব, কি গজব! এরপর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন– দোহাই সুরমা রানী, এ লড়াইয়ে জয় তোমারই। একশো ভাগ তোমারই জয়। আমি রণভঙ্গ দিলাম আর গোসলখানায় চললাম। গরম খানা বরফ করে খাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। জয় রাধা মাধব... গামছা খুঁজে নিয়ে সুরতান সাহেব গোসলখানায় ছুটলেন।

০ ০ ০

কেটে চললো দিন আর ক্রমশই সুখবরের আলামত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। সুরমা বিবির পেট স্ফীত হয়ে উঠতে লাগলো দিন দিন। এতে করে শুরু হলো সুরমার পিতা-মাতার দৌড় ঝাঁপ ও দাই বৈদ্যের তৎপরতা। গায়ে তার উঠতে লাগলো হরেক রকম তাবিজ পলতে ও শিকড় বাকলা, পড়তে লাগলো নানা প্রকার তেল মলমের প্রলেপ। বেড়ে গেল পুষ্টিকর খাবার পথ্যের সরবরাহ। তুঙ্গে উঠলো সেবা-শুশ্রূষার তাকিদ। পিতা-মাতাসহ দিবারাত্রি সর্বক্ষণ সুরমাকে ঘিরে রইলো দুই বাড়ির সমুদয় কাজের ঝি। কাজের লোক হরিদাসদের শুরু হলো ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা। চাহিবা মাত্র হাজির চাই সব কিছু। তবু তারা ক্লান্তিবোধ করে না। কারণ, পিতৃতুল্য কত্তা বাবু লাভ করছেন বংশধর।

অবশেষে একদিন শেষ হলো প্রতীক্ষার দিন। কন্যার শাদি দেয়ার দুশ্চিন্তা থেকে সুরতান সাহেবকে মুক্তি দিয়ে সুরমা বিবি প্রসব করলেন একটি আকর্ষণীয় পুত্র সন্তান।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে সুরতান সাহেব বুলন্দ কণ্ঠে আযান দিলেন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। দাসদাসীরা ফুঁকতে লাগলো শাঁখ শঙ্খ আর পিটাতে লাগলো ঢোল-কাঁশি। হরিদাস ছুটে এলো ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে। দুই বাড়িতে ছুটতে লাগলো বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের প্লাবন।

প্রসবস্থল থেকে সন্তানসহ প্রসূতিকে ঘরে তোলার পর এবার সুরতান সাহেবের কাছে বিজলী বালা ছুটে এলো মিষ্টির বায়না নিয়ে। সুরতান সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করলেন তার প্রতিশ্রুতি। বিজলী বালাসহ সকল দাসদাসীকেই তিনি বসিয়ে দিলেন মিষ্টির গামলার পাশে। সুরমার পিতা-মাতারা মিষ্টি বিতরণ শুধু

দাসদাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না। দাই বৈদ্যসহ পাড়া প্রতিবেশী সবার মধ্যেই অকাতরে মিষ্টি বিতরণ করলেন তারা।

আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়েই কয়েকদিন কেটে গেল। এরপর এলো সদ্যজাত শিশুর নামকরণের প্রশ্ন। পিতামাতা ও সুরমা বিবি তিনজন তিনটি পৃথক পৃথক নাম প্রস্তাব করলেন। দাসদাসীরাও নানান নামের প্রস্তাব তুলে ধরলো। কিন্তু পুত্রের কোন নামই সুরতান সাহেবের মন মত হলো না। হরিদাসের সাথে একদিন চট্টগ্রাম শহর দেখতে গিয়েছিলেন সুরতান সাহেব। সেখানে জাহাজঘাটের এক খালাসীর কাছে দাতা হাতিম তায়ীর গল্প শুনে এসেছিলেন তিনি। গল্পটা, বিশেষ করে হাতিম তায়ীর চরিত্রটা, তাঁর চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। তাই পুত্রের নামকরণ করার সময় ঐ দাতা হাতিমের নামটা স্মরণে এলো তাঁর। ফলে, ঐ হাতিম নামটাই রাখলেন তিনি পুত্রের।

মুসলমান জামাই তাঁর নিজের ছেলের মুসলমান নাম 'হাতিম' রাখলেন দেখে শ্বশুর শাশুড়ি আর আপত্তি করতে পারলেন না। তারা খুশি হয়েই সমর্থন করলেন সে নাম। সুরমা বিবিও খুশি হয়ে সমর্থন দিলেন স্বামীকে। সবাই হাতিম নাম খুশি মনে সমর্থন করায় দাসদাসীরাও খুশি হয়ে আওয়াজ তুললো– 'বাহবা! বেশ নাম, চমৎকার নাম! পছন্দ আছে দাদাবাবুর। তাঁর রাখা এই হাতিম নামটা সত্যিই একটা অপূর্ব নাম। আমাদের এই এলাকায় দাদাবাবু একজন নতুন মানুষ। তাঁর সন্তানের এই রকম নতুন নামই হওয়া উচিত। সাবাসী দেই দাদাবাবুকে।'

এক কথায়, সুরতান সাহেব আর সুরমা বিবির সন্তানের এক বাক্যে আর সর্বসম্মতিক্রমে নাম হলো হাতিম। হাতিম নামেই সন্তান তাঁদের বড় হতে লাগলো এবং পিতামাতা ও নানা-নানীর কোলে দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতে লাগলো।

৯

শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের ব্যবসায়ী জাহাজের মনোরম কক্ষে বসে গুরুদাসকে শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনী বর্ণনা করে শোনাচ্ছেন হাজী খলিল পীর সাহেব। বাখরগঞ্জ জেলার হরিরাম নগরের অত্যাচারী রাজা বলরামকে হত্যা করে শাহ সুলতান সাহেব বলরামের মন্ত্রী বাহাদুরকে হরিরাম নগরের রাজা বাহাদুর বানালেন আর কয়েক দিনের জন্যে সবাইকে নিয়ে এই নতুন রাজার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এই পর্যন্ত বর্ণনা করে থেমে গেলেন হাজী খলিল পীর সাহেব এবং বিরাম নিতে লাগলেন। বেশ কিছু দিন তথা অনেক দিন তিনি আর কাহিনী বর্ণনা করলেন না। এর মধ্যে শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের জাহাজ আরবের জাহাজঘাটে পৌঁছে গেল। উল্লেখ্য যে, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে এ জাহাজ আরবে পৌঁছতে তিন মাসের স্থলে প্রায় চার মাস সময় লাগলো।

যা হোক, জাহাজ ঘাটে পৌঁছলে শেখ আবদুল আজিজ সাহেব জাহাজ থেকে চট্টগ্রামের মাল নামিয়ে তার পাইকারদের দিতে লাগলেন এবং জাহাজ খালি হলে তিনি পুনরায় আরবের মাল তুলে জাহাজ ভর্তি করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, শেখ সাহেব তার কর্মচারী আর কামিন মজুরদের দ্বারা এই মাল নামানো উঠানোর কাজ করতে লাগলেন। নানা সমস্যায় এতে প্রায় দুই মাস সময় লাগলো। এই ফাঁকে খলিল পীর সাহেব গুরুদাসকে জাহাজে রেখে সপ্তাহ খানেকের জন্যে জাহাজ থেকে নেমে গেলেন আর নিজের দেশটা ঘুরে ফিরে দেখে এলেন। খলিল পীর সাহেব জাহাজে ফিরে আসার পরও মাল তুলে জাহাজ ভর্তি করতে আরো দুই তিন সপ্তাহ লাগলো। মাল তোলা শেষ হলে শেখ আবদুল আজিজ সাহেব আবার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলেন জাহাজ।

সকল হুটহাট আর ঝুট-ঝামেলা শেষ হলো। এবার হাজী খলিল পীর সাহেব গুরুদাসকে ডেকে বললেন– গুরুদাস, আমার কাছে এসো। শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনীটা আবার শুরু করা যাক।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে গুরুদাস বললো– শুরু করবেন হুজুর? শুরু করবেন এখন?

Boighar & BABD

পীর সাহেব বললেন– হ্যাঁ। এখনই শুরু করি। চট্টগ্রামে পৌঁছার আগেই কাহিনীটা আমি শেষ করতে চাই। চট্টগ্রামে পৌঁছার পর মনের অবস্থা আবার কেমন হয়, কে জানে! শাহ সুলতান সাহেবকে তোমাদের ওখানে পাবো না আবার হারিয়ে ফেলবো, আল্লাহ মালুম! হয়তো কাহিনীটা শেষ করার আর কোন উৎসাহই পাবো না।

: হুজুর!

: এসো, কাছে এসে বসো।

গুরুদাস নিজের আসন থেকে সানন্দে ওঠে এসে পীর সাহেবের আসনের সামনে বসলো এবং উৎফুল্লকণ্ঠে বললো– জি হুজুর, করুন। আবার তাহলে শুরু করুন কাহিনীটা।

পীর সাহেব বললেন– কোন পর্যন্ত কাহিনীটা বলেছি, তা কি মনে আছে?

: জি হুজুর, আছে আছে। ঐ যে বাখরগঞ্জ জেলার হরিরাম নগরের নতুন রাজার অতিথি হয়ে সবাই আপনারা সেখানে রইলেন– এই পর্যন্ত বলেছেন।

www.boighar.com

: তারপর?

: এই পর্যন্ত বলে আপনি বিরাম নিতে লাগলেন হুজুর, তারপর আর বলেননি। অনেক দিন বলেননি।

: কেন বলিনি?

: বলার মতো পরিস্থিতি তারপর আর ছিল না, তাই বলেননি হুজুর। বলার মতো নিরিবিলি পাননি।

: অর্থাৎ?

: অর্থাৎ ইতোমধ্যে এই জাহাজ আরবের জাহাজ ঘাটে পৌঁছে গেল। জাহাজের মালিক চট্টগ্রামের মাল নামিয়ে দিয়ে আবার আরবের মাল জাহাজে তুলতে লাগলেন। আপনিও জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে নিজের দেশটা ঘুরে ফিরে দেখে এলেন। এইসব ঝুট-ঝামেলার মধ্যে কাহিনী বলার মতো পরিবেশ ছিল না বলেই আর বলেননি হুজুর। ঝুট-ঝামেলাটা অনেক দিন পর্যন্ত চললো তো।

: সাব্বাস! এখন তো আর কোন ঝুট-ঝামেলা নেই, না কি বলো?

: জি হুজুর! এখন সব শান্ত আর আপনারও এখন অখণ্ড অবসর। এখন দয়া করে কাহিনীটা আবার শুরু করলে বড়ই খুশি হতাম হুজুর। সময়টাও আমাদের কেটে যেতো স্বচ্ছন্দে।

: বহুত খুব। আবার তাহলে শুরু করি, শুনো।

Boighar & BABD

খলিল পীর সাহেব শাহ সুলতান সাহেবের কাহিনীটার অবশিষ্ট অংশ আবার শুরু করলেন–

হরিরাম নগরের নতুন রাজার অতিথি হয়ে আমরা কয়েকদিন তার প্রাসাদেই রয়ে গেলাম। কয়েক দিন পর শাহ সুলতান সাহেব এই নতুন রাজাকে বললেন– বেশ কয়েক দিন তো বসে বসেই কেটে গেল। এবার এযাযত দিন জনাব, আমরা এবার উঠি।

হরিরাম নগরের নতুন রাজা বললেন– এত তাড়া কেন জনাব? দয়া করে আর কয়েকটা দিন থাকুন। আপনার কাছে আমি আকণ্ঠ ঋণী। আপনাদের মেহমানদারী করার আর কয়েক দিন সময় পেলে আমি বড়ই তৃপ্তি বোধ করতাম।

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– আপনার এই পবিত্র অন্তরের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু আর নয় জনাব। বেশ কিছুদিন অমনি অমনি কেটে গেল। এবার আমরা আমাদের কাজে নামতে চাই।

: জনাব!

: যে কাজের জন্যে আমরা এদেশে এসেছি। সে কাজ ফেলে রেখে অধিক দিন বসে থাকাটা কতর্ব্যের প্রতি আমাদের অবহেলারই শামিল। আর বসে থাকা চলে না জনাব।

: সে কথা ভাবলে অবশ্য আপনার অনুভূতিটা উপেক্ষা করা যায় না। তাহলে এবার কোন দিকে যাবেন জনাব?

: জনাব, আমরা এদেশে ইসলামের আলো জ্বালতে এসেছি। বাতিল দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। যেখানে অসত্যের অন্ধকার বেশি, গোমরাহীর নিষ্পেষণে অসহায় জনগণ যেখানে দলিত মথিত, সত্যের আলো জ্বালাতে আমরা সেখানে আগে যেতে চাই।

: এমন কোন এলাকা কি জনাবের নজরে আগে থেকেই আছে?

: জি না জনাব। এদেশে আমরা এই নতুন এসেছি। কোন এলাকা অঞ্চলই আমরা চিনিনে বা জানিনে। খুঁজে পেতে দেখতে হবে জনাব।

: তাহলে আমি একটা কথা বলতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন।

: বলুন জনাব, বলুন। আপনার কোনো কথাতেই কিছু মনে করবো না আমরা।

: কথা মানে, আমি তো এ দেশেরই লোক জনাব। অসত্যের অন্ধকার আর নির্যাতন যেসব অঞ্চলে বেশি, সেসব অঞ্চলের অনেকগুলোরই খবর আমি জানি।

Boighar & BABD

: জানেন? আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে দিন জনাব, কোথায় আমাদের আগে যাওয়া প্রয়োজন, সে নির্দেশনা দিন। অন্ধকারে হাতিয়ে তো আমরা ঠিক জায়গা সহজে পাবো না। আপনি সে হদিস দিলে আমরা বড়ই বাধিত হবো।

: আমার জানামতে অসত্যের আস্ফালন আর অত্যাচার মহাস্থানে সর্বাধিক। সেখানেই সবার আগে বাতিলের কদর্য দূরীভূত করে সহির সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

: মহাস্থান? মহাস্থান কোথায় জনাব?

: মহাস্থান বগুড়া জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেখানকার রাজা পরশুরাম যেমনই দাম্ভিক, তেমনি অত্যাচারী। এই হরিরাম নগরের ভূতপূর্ব রাজা বলরামের চেয়েও এই পরশুরাম অধিক দুর্বৃত্ত আর দুর্জন। সাথে আপনার যেহেতু একটা দুর্ধর্ষ বাহিনী আছে, সেহেতু সেখানে যেতে আপনাদের ভীত হওয়ার কারণ নেই। অন্য কথায়, ঐ দুর্বৃত্তের এলাকায় সত্য প্রতিষ্ঠা করার আপনারাই যোগ্য লোক। আমি মনে করি, আপনাদের সর্বাগ্রে সেখানেই যাওয়া উচিত।

: তাই যাবো জনাব। ইসলামের শাশ্বত আলো জ্বালাতে সেখানেই আমরা আগে যাবো। এবার বলুন জনাব, সেখানে যাওয়ার পথটা বলুন।

: সহজ পথ জনাব, আপনাদের জন্যে খুবই সহজ পথ। জলপথে খরস্রোতা করতোয়া নদী সরাসরি চলে গেছে বগুড়া জেলার মধ্যে দিয়ে মহাস্থানে। নদীটি যেমনই গভীর তেমনই প্রশস্ত। ঐ নদীতে জাহাজ ভাসিয়ে দিলে আপনারা একটানা চলে যাবেন সেখানে।

: আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে আর কোন চিন্তা নেই জনাব! এবার এযাযত দিন, আমরা রওনা হই।

: কাজে এসেছেন আপনারা। আপনাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে চাইনে। তাহলে আসুন জনাব। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হোন!

: আল্লাহ তায়ালা আপনারও সার্বিক কল্যাণ করুন। তাহলে চলি জনাব। আল্লাহ হাফেজ!

: আল্লাহ হাফেজ...!

০ ০ ০

বলেই চললেন হাজী খলিল পীর সাহেব। অতঃপর গুরুদাসকে তিনি বললেন– মহাস্থানের রাজা পরশুরাম দুর্বৃত্ত হলেও তার ভগ্নি শীল দেবী ছিলেন অত্যন্ত সৎ, উদার, বুদ্ধিমতী আর অতিশয় রূপসী রমণী। বয়স বিশের উপরে অথচ অনূঢ়া। আজও অবিবাহিতা। বিবাহের প্রতি শীলা দেবীর একান্ত অনিহাই এর জন্যে দায়ী। কারণ, একদিকে নিরন্ন জনতা, অন্যদিকে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী। এর মধ্যে মনের মতো মানুষ খুঁজে পাননি শীলা দেবী। এই বৈরী পরিবেশে পারবেও না কখনো। তাই বিবাহের আশা পুরোপুরি ত্যাগ করেই বসে আছেন তিনি।

এদিকে আবার শীলা দেবীর সখী গৌরী রানীও সাবালিকা, বুদ্ধিমতী ও রসিকা মহিলা। শীলা অন্তপ্রাণ। শীলা দেবীই ধ্যান আর শীলা দেবীই স্বপ্ন তার। এতে করে রাজার অত্যাচার আর অবিচারের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে এরা দু'জন একে অন্যের স্বস্তি আর সান্ত্বনার অবলম্বন। চটুল রসিকতার মধ্যে নিমগ্ন হয়েই অবসর বিনোদন করেন তারা। রসিকতার সাহায্যেই পেতে চান সান্ত্বনা, স্বস্তি ও শান্তি।

সেদিনও তারা নিমগ্ন হলেন এমন চটুল রসিকতার মধ্যে। সেদিনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বিবাহ। দু'চার কথার পরই সেদিন গৌরী রানী শীলা দেবীকে বললেন– সখী, বয়সটা যে গাছ-পাথর পেরিয়ে গেল। বিবাহের চিন্তা-ভাবনা কি করেছো কিছু? না করে থাকলে সে চিন্তা-ভাবনাটা জোরদারভাবে করো। বয়স থাকতে না করলে কিন্তু পস্তাতে হবে শেষ কালে।

জবাবে শীলা দেবী বললেন– করেছি সখী, অনেক আগেই করেছি।

গৌরী রানী খুশি হয়ে বললো– করেছো? সাব্বাস? তা ফলাফল?

: অশ্বডিম্ব।

: কেন কেন?

: কেন, তা কি গৌরি রানী বোঝেন না? সখী, এই আঁটকুড়ে পরিবেশে মনের মতো মানুষ যে একজন ছাড়া আজ পর্যন্ত আর দ্বিতীয়টি পেলাম না!

: পেয়েছো একজন? ওম্মা! কে সে?

: তুমি! তুমি সখী, তুমি। তোমাকে ছাড়া খুঁজে তন্ন তন্ন করেও আর কাউকে পাইনি। তাই ভেবে দেখে ছিলাম পুরুষ হলে তোমার গলা ধরেই ঝুলে পড়তাম আমি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য!

Boighar & BABD

আমার সখী পুরুষ নয়, নারী। আমারই মতো একজন মনের মতো মানুষ চাই তারও। সুতরাং ভেবে দেখার ফল হলো অশ্বডিম্ব। তাই ওসব চিন্তা-ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি সখী।

: বললেই হলো? ছেড়ে দিলে চলবে কেন? মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিয়ের চিন্তা করতে হবে আর মনের মতো মানুষের খোঁজ করতে হবে। মেয়ে মানুষের কি স্বামী ছাড়া চলে?

: আমার সখীর বোধ হয় চলে?

: মানে?

: মানে, তোমার বয়সেরও তো কোন গাছ পাথর নেই, সখী। তবু তুমি এত দিন বিয়ে করোনি কেন?

: সেটা তোমারই জন্যে সখী। তোমার কথা ভেবেই বিয়ে করিনি আজও।

: অর্থাৎ?

: অর্থাৎ তুমি রাজকুমারী আমি রাজকুমারী নই। আমি চেষ্টা করলেই এই রাজ্যের বাইরে আমার পছন্দমতো যাকে তাকে বিয়ে করতে পারি আমি। কিন্তু তুমি তো তা পারো না সখী। তোমার পদমর্যাদায় বাধবে।

: তাতে তোমার কি?

www.boighar.com

: আমারই তো সব। আমি বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেলে তোমার কি হবে সখী? এই পাষাণ পুরীতে একা একা তোমার দশা কি হবে? সঙ্গীর অভাবে তুমি যে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে সখী। তাই তোমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমি বিয়ে করি কিভাবে? তোমার বিয়ে হলে অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গ পেলে তার পরের দিনই বিয়ে করবো আমি।

: বিয়ে করতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনের মতো মানুষ তুমি পাবে?

: পদমর্যাদা না দেখলে, মনের মতো মানুষের অভাব কি এই দুনিয়ায়। যখন চাইবো, তখনই পাবো।

: সত্যি বলছো সখী? তাহলে দাও না আমাকে তেমন একটা মানুষ খুঁজে? আমিও পদমর্যাদা দেখবো না। এই রাজ্যের ভেতরে হোক আর বাইরে হোক, আমার মনের মতো হলেই তাকে আমি বিয়ে করবো। বিয়ে করে এই পাষাণপুরী ত্যাগ করে চলে যাবো।

: সত্যি বলছো?

Boighar & BABD

: সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি সখী। দাও না আমাকে তেমন একটা মানুষ খুঁজে?

: ঠিক আছে। আমি কথা দিলাম সখী, তোমার মনের মতো একটা মানুষ আমি অচিরেই কোথাও না কোথাও থেকে খোঁজে বের করবোই। আজ থেকেই সে কাজে আত্মনিয়োগ করলাম আমি। আজ থেকেই।

: ঈশ্বর তোমার সহায় হোক!

এই সময় অন্তঃপুরের এক দাসী এসে শীলা দেবীকে বললো– মা জননী, মহারাজ তাঁর ঘরে কি যেন একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না। আপনাকে উনি ডাকছেন। এখনই যান মা জননী, নইলে উনি রাগ করবেন।

: মরণ! এই বলে শীলা দেবী সেদিকে ছুটলেন। রসালাপ তাদের বন্ধ হলো সেদিনের মতো।[১]

এই ঘটনার পরের দিনই শাহ সুলতান সাহেব মহাস্থানের সদরঘাটে জাহাজ ভিড়িয়ে দিলেন। সবখানে যা হয় এখানেও তাই হলো। মাছের আকৃতি বিশিষ্ট এই অদ্ভূত জাহাজ দেখে ঘাটে ছুটে এলো প্রচুর নরনারী। ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরিহিত কঙ্কাল সার নরনারী। জাহাজটাকে বিরাট এক মাছ বলেই প্রথমে তাদের ভুল হয়েছিল। পরক্ষণেই খেয়াল করে বুঝতে পারলো, বিশাল মাছ নয়, এটি একটি বিশাল জাহাজ। তাই অবাক বিস্ময়ে সবাই দম বন্ধ করে দেখতে লাগলো জাহাজটি।

এরপর শাহ সুলতান সাহেব যখন জাহাজ থেকে ঘাটে নেমে এলেন, তখন উপস্থিত নরনারীরা চমকে উঠে বললো– ওরে বাপরে! দেবদূত দেবদূত! আমাদের ভস্ম করে দেবে! পালাও... পালাও...!

দৌড় দেয়ার জন্যে সবাই ঘুরে দাঁড়াতেই শাহ সুলতান সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– এই যে দাদারা, এই যে দিদিরা, যাবেন না, যাবেন না। আমি বাঘ ভাল্লুক নই, দেব-দৈত্যও নই। আপনাদের মতোই আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। দয়া করে দাঁড়ান।

বিস্মিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সকলে। একে অন্যকে বলতে লাগলো, আরে! উনি নাকি সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ এত সুন্দর হয়?

অন্য ক'জন বললো– তাই তো দেখছি। কথাও বলছেন মানুষের মতোই।

---

১. গৌরী রানীর বর্ণনা থেকেই খলিল পীর সাহেব এসব কথা জেনে ছিলেন।

Boighar & BABD

শাহ সুলতান সাহেব বিনীতকণ্ঠে বললেন– মানুষ, মানুষ। আমি আপনাদের মতোই মানুষ। আমার কয়টা কথা জানার আছে। দয়া করে আমার কথা কয়টার জবাব দিন দাদারা, দিদিরা। দোহাই আপনাদের, আমাকে ভুল বুঝবেন না।

এবার একজন কংকালসার বৃদ্ধ তাদের সবাইকে বললেন– আরে থামো থামো! আমাদের মতো নোংরা নগণ্য মানুষদের বড়ই সম্মান করে কথা বলছেন উনি। মানুষ হলেও উনি দেবতুল্য মানুষ! দেবতুল্য মানুষ হয়ে কত অনুনয় বিনয় করছেন উনি আমাদের কাছে। না পালিয়ে উনার কথা শোনাই উচিত আমাদের।

এ কথায় কেউ কেউ বললো– তাহলে তুমি কথা বলো মোড়ল। অনেকেই বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই উনার সাথে কথা বলো রঘুপতি দাদু। কথা বলো আর উনি কি জানতে চান, তা শোনো। আমাদের তো কোন হুঁশ-বুদ্ধি নেই। ঐ রকম দেবতুল্য মানুষের কাছে কি বলতে কি বলবো, কোন কথার কোন জবাব দেবো, তার কি কিছু ঠিক আছে?

বৃদ্ধ মোড়ল রঘুপতি বললেন– আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমিই এগিয়ে গিয়ে দেখি...

বৃদ্ধ রঘুপতি সামনে এগিয়ে আসতেই শাহ সুলতান সাহেব খুশি হয়ে বললেন– আসুন মোড়ল সাহেব, আসুন। আপনি প্রবীণ লোক। গুরুজন মানুষ। আপনিই আমাকে সঠিক তথ্য দিতে পারবেন।

মোড়ল রঘুপতি বললেন– বলুন কত্তা, কি জানতে চান, বলুন।

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– কত্তা নয়, ভাই। আমি আপনার নাতির বয়সী মানুষ। দয়া করে আপনি আমাকে ভাই বলুন।

বৃদ্ধ রঘুপতি স্বগতোক্তি করলেন– আহা! কি মহৎ মানুষ!

এরপর প্রকাশ্যে বললেন– বলুন ভাই, কি বলতে চান, বলুন?

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– বলতে চাই মানে, আমার কিছু কথা জানার ছিল আপনাদের কাছে।

: তাতে কি বেশী সময় লাগবে?

: হ্যাঁ মোড়ল, কিছুটা সময় লাগবে বৈ কি! যদি দয়া করে এই কষ্টটা করেন...

: আহ্‌হা, আমার কষ্টের কথা বলছিনে ভাই। বলছি আপনার কষ্টের কথা। এই ঢালু আর পিছলে ঘাটের উপর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে আপনারই কষ্ট হবে।

: তা হলে আর কি করবো?

: আমি একটা কথা বলি– যদি কিছু মনে না করেন...

: বলুন, বলুন...

: বাবু, আপনি একজন মস্তবড় ভদ্রলোক! আমরা নিচু জাতের মানুষ। নমঃ মানে নমোশূদ্র আমরা। জমি চাষবাস করা নোংরা নগণ্য মানুষ। যদি ঘৃণা না করেন, তাহলে আমাদের পাড়ার উপর সমান জায়গায় উঠে এসে কথা বলতে পারেন।

: আরে ছিঃ ছিঃ! ঘৃণার কথা বলছেন কেন? আমার কাছে সব মানুষ সমান। কোন ছোট বড় ভদ্র শূদ্র নেই। সব মানুষ সমান।

: সাব্বাস! তাহলে আসুন...

শাহ সুলতান সাহেব মোড়লকে অনুসরণ করলেন। আমাকে ডেকে বললেন– খলিল পীর সাহেব, আপনি আমার সাথে আসুন।

আমরা গিয়ে হাজির হলাম নমঃপল্লীতে, রঘুপতি মোড়লের বাড়িতে। খোলা আঙ্গিনায় একটি ঢিঁপির মতো উঁচু জায়গায় পাশাপাশি দু'টি পিঁড়ি পেতে দিয়ে রঘুপতি মোড়ল বললেন– আমাদের ভাল কোন আসন নেই বাবু। যদি কিছু মনে না করেন, দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে আপনারা এই পিঁড়ির উপর বসুন!

: 'ঠিক আছে ঠিক আছে!' –বলে শাহ সুলতান সাহেব হাসতে হাসতে ঐ ধূলো-মাটির ঢিঁপির উপর পাতা পিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়লেন। তা দেখে আমিও অপর পিঁড়িটায় বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে কালো চেহারার আর ময়লা পোশাকের অগণিত নরনারী এসে চারদিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো আমাদের। শাহ সুলতান সাহেব এবার রঘুপতির সাথে শুরু করলেন কথা বলা। কথা বলা শুরু করতেই আর এক ঘটনা ঘটে গেল। নমঃমেয়েরা যে পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের পেছনে চুপি চুপি এসে দাঁড়ালেন ছদ্মবেশী দুই মহিলা। এঁরা রাজকুমারী অর্থাৎ রাজভগ্নি শীলা দেবী ও তাঁর সখী গৌরী রানী।

ঘটনা:

প্রাসাদের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তারা। সেদিন রাজা পরশুরাম প্রাসাদে ছিলেন না। এই সুযোগে আর গৌরী রানীর পরামর্শে শীলা দেবী ও গৌরী রানী সাধারণ মেয়ে ছেলের ছদ্মবেশ ধারণ করে পালকি যোগে চলে এলেন রাজধানীর একদম উপকণ্ঠে। সেখানে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে হাওয়া খেয়ে তারা প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছিলেন নমঃ পাড়ার পাশ দিয়ে। যেতেই তারা দেখলেন, এক বাড়িতে প্রচুর নরনারী ভিড় করছে। আরো দেখলেন, অনেক নরনারী ছুটে যাচ্ছে সেই বাড়ির দিকে। ঘটনাটা দেখার জন্যে পালকি আড়ালে রেখে তারা চলে এলেন সেই বাড়িতে আর চুপি চুপি এসে মেয়েদের ভীড়ের

Boighar & BABD

পেছনে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশ ধরেছিলেন বলে তাদের কেউ চিনতে পারলো না।

মেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়েই তারা বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, একদম তাদের হাতের কাছে মাটির ঢিঁপির উপর বসে আছে দেবদূততুল্য এক মানব সন্তান। এতই তিনি দর্শনধারী যে, দেবদূতও হার মানে তাঁর চিত্তহারী চেহারার কাছে। দেখে মোহিত হয়ে গেলেন শীলা দেবী আর গৌরী রানী। এরপর সেই মানব সন্তান কথা বলা শুরু করলে আস্তে আস্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন তারা। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন তাঁর কথা।

শাহ সুলতান সাহেব রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তাদের আর এই এলাকার সকল মানুষের হতদরিদ্র অবস্থার কারণ। জানলেন, সবাই এরা রাজা পরশুরামের প্রজা। রাজার নির্দেশে, নিজেরা অনাহারে থেকে তারা তাদের যথাসর্বস্ব রাজার পায়ে ঢালে। কমতি হলেই রাজা তাদের ধরে ধরে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়। রাজা তাদের জানিয়েছেন, প্রজাদের জন্মই রাজার পায়ের তলে থাকার জন্যে। রাজা তাদের ভগবান। তাদের প্রভু। প্রজারা রাজার সেবাদাস আর রাজার পায়ের তলের জীব। তাদের যথা সর্বস্ব রাজার পায়ে ঢাললে, তবেই তাদের মুক্তি। পরকালে তবেই তাদের স্বর্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কার্পণ্য করলেই নরক বাস। রৌরব নরকে তাদের স্থান। কাজেই প্রতিযোগিতা করে তাদের সবকিছু ঢালতে হবে রাজার পায়ে অর্থাৎ তাদের ভগবান তথা প্রভুর পায়ে। প্রতিযোগিতা করে অনাহারে থাকলে তবেই তারা খুশি করতে পারবে তাদের প্রভুকে, তথা তাদের ভগবানকে।

শুনে শাহ সুলতান সাহেব বললেন– এগুলো সবই রাজার প্রতারণা। মানুষ কখনো ভগবান নয়। মানুষ কেউ কারো প্রভু নয়, কেউ কারো দাস নয়। মানুষের মধ্যে কোন ছোট বড় নেই।

এরপর শাহ সুলতান সাহেব জানালেন, তিনি মুসলমান। ইসলাম ধর্মের লোক। ইসলামে কোন ছোট বড় নেই। কারো সম্পদ কেউ কেড়ে খেতে পারে না। বরং যার বেশি আছে সে তার সম্পদের নির্দিষ্ট এক অংশ যার নেই বা কম আছে, তাকে দিতে বাধ্য। নইলে ঐ বেশিওয়ালার ইসলামে স্থান নেই আর ঐ বেশিওয়ালারই নিশ্চিত নরক বাস।

এভাবে শাহ সুলতান সাহেব অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে আর সুমধুর ভাষায় ইসলামের মাহাত্ম্য সবার সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। নিজের হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে অন্যের হৃদয় গলিয়ে দিতে লাগলেন। এর ফলে অনেকেই অত্যন্ত

আগ্রহীকণ্ঠে বলে উঠলো– আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো হুজুর। আমাদের মুসলমান বানিয়ে নিন। এই মিথ্যা আর ভাঁওতার মধ্যে আর আমরা থাকবো না।

কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বললো- ওরে বাপরে! তাহলে বিপদ হবে। ইসলাম কবুল করার প্রবল ইচ্ছা তো আমাদের মনেও জেগেছে। কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলে মহাবিপদ হবে। একথা শুনলেই রাজা পরশুরাম আমাদের শিরশ্ছেদ করবে।

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– ভয়ের কোন কারণ নেই। ইসলাম আপনাদের সত্যি সত্যিই ভাল লাগলে আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। আপনাদের বিপদ আমি দেখবো। আমার সাথে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আছে। আপনাদের এ বিপদ আমিই দূর করে দেবো। এ বিপদের বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত আমি আপনাদের ছেড়ে যাবো না।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত আওয়াজ উঠলো– হুজুরের জয় হোক। আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। আমাদের মুসলমান করে নিন। দয়া করে এখনই মুসলমান করে নিন...!

এতক্ষণ যে জনতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে জনতা এবার বিপুল উল্লাসে ছুটোছুটি করতে লাগলো। ভীড় ভেঙ্গে যেতে লাগলো দেখে শীলা দেবী ও গৌরী রানী দ্রুত ফিরে গিয়ে পালকিতে উঠলেন এবং প্রাসাদে ফিরে এলেন।

রাজ প্রাসাদে ফিরে এসে শীলা দেবী গৌরী রানীকে মহানন্দে বললেন– সখী, আমি পেয়ে গেছি! আমার মনের মতো মানুষ আমি পেয়ে গেছি! আহা! কি চিত্তহারী রূপ আর কি সুমিষ্ট ভাষা! আমি ঐ অপরূপ সুন্দর মুসলমানকেই বিয়ে করবো। তুমি প্রস্তাব পাঠাও সখী, অবিলম্বে প্রস্তাব পাঠাও...

গৌরী রানী বললেন– তা পাঠাতে হলে আগে তোমাকে মুসলমান হতে হবে। কোন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব তার কাছে দেয়াই যাবে না।

: তাহলে তাই আমি হবো। মুসলমানই হবো। তবু ঐ মানুষকেই আমি চাই।

: তাহলে তোমার ভাইকে রাজি করাও আগে। তাকে বলো– 'দাদা, আগে আমি বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলাম না। কিন্তু এখন বিয়ে করতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। সেজন্যে আমি মুসলমান হবো। আর একজন মুসলমানকে বিয়ে করবো। তুমি অনুমতি দাও। না দিলে আমি আত্মহত্যা করবো।'

এরপর গৌরী রানী বললেন– আমার বিশ্বাস, আত্মহত্যা করার কথা শুনলে তোমার দাদা অবশ্যই রাজি হবেন।

Boighar & BARD

শীলা দেবী বললেন– ঠিক আছে, ঠিক আছে। দাদাকে আমি তাই বলবো। দাদা কয়েক দিন খুবই ঝামেলার মধ্যে আছেন। তার ঝামেলা কেটে গেলেই আমি তাকে তাই বোঝাবো।

অতঃপর শীলা দেবী উতলা হয়ে উঠলেন। আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। দাদার অনুমতি পেতে দেরী হবে বুঝে গৌরীকে সাথে নিয়ে তিনি পালকি করে পুনঃ পুনঃ বাইরে বেরোতে লাগলেন এবং যেখানে আর যে পল্লীতে শাহ সুলতান সাহেব ইসলাম প্রচার করছিলেন, সেখানে গিয়ে তাকে আড়াল থেকে দেখে আসতে লাগলেন। শাহ সুলতান সাহেবের অদর্শন তার কাছে নিদারুণ কষ্টের কারণ হয়ে উঠলো।

কিন্তু সকলই গরল ভেল। ইতোমধ্যে খবর গেল রাজা পরশুরামের কানে। তিনি শুনতে পেলেন, তার প্রজারা দলে দলে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। শুনেই রাজার মাথায় আগুন ধরে গেল। এরই মাঝে তার ভগ্নি শীলা দেবী ইসলাম গ্রহণের অনুমতি চাইলে আগুন লাগলো বারুদের ঘরে। রাজা পরশুরাম তৎক্ষণাৎ শীলা দেবীকে প্রাসাদে বন্দী করে রাখলেন এবং সৈন্য সামন্তসহ ইসলাম প্রচারক শাহ সুলতানের বিরুদ্ধে মার মার রবে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

শাহ সুলতান সাহেবও তৈরি ছিলেন সেজন্যে। তিনি তখন রাজধানীর দূরপ্রান্তে ইসলাম প্রচার করছিলেন। ফৌজদার নূর মুহম্মদ সাহেব তার বাহিনী নিয়ে পাহারা দিয়ে রেখেছিলেন শাহ সুলতান সাহেবকে। রাজধানীর ঐ দূর প্রান্তেই শুরু হলো লড়াই। এদিকে রাজা পরশুরাম লড়াইয়ে যাত্রা করার পরে পরেই গৌরী রানীর নির্দেশে প্রাসাদের রক্ষীরা শীলা দেবীকে মুক্ত করে দিলো। শীলাদেবী অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে যুদ্ধের ফলাফলের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে দুর্ধর্ষ শাহ সুলতান সাহেবের তরবারি আর ফৌজদার নূর মুহম্মদ সাহেবের চৌকস অত্যন্ত সুদক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীর সামনে রাজা পরশুরাম ও তার সাদামাটা বাহিনী মোটেই অধিকক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই শেষ হলো লড়াই। ফৌজদার সাহেবের কয়েকজন সৈন্য কিছুটা আহত হলেও রাজা পরশুরাম যুদ্ধ ক্ষেত্রেই সসৈন্যে নিহত হলেন। তার সৈন্যরা কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতেও পারলেন না।

কিন্তু এরপরও শীলা দেবীর আশা পূরণ হলো না। লড়াই শেষ হওয়ার পরে পরেই দূত মারফত খবর চলে এলো রাজপ্রাসাদে। দূত এসে রাজা পরশুরাম সসৈন্যে নিহত হয়েছেন বলতে গিয়ে ভুল করে হঠাৎ বলে ফেললেন, শাহ সুলতান সাহেব সসৈন্যে নিহত হয়েছেন।

ভুল সংশোধন করার সময়ই পেলো না দূত। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদই পৌঁছে গেল অন্তঃপুরে। সংবাদ শুনেই শীলা দেবী মূর্ছা গেলেন। সবাই মিলে শীলা দেবীর মূর্ছা ভাঙ্গিয়ে দিলেও শেষ রক্ষা হলো না। মূর্ছা ভাঙ্গার পরেই শীলা দেবী সবার অলক্ষ্যে দৌড় দিলেন খরস্রোতা করতোয়া নদীর দিকে। একটু পরই টের পেয়ে গৌরী রানীসহ অনেকেই ছুটে এলেন নদীর ধারে।

www.boighar.com

কিন্তু এবারেও শেষ রক্ষা হলো না। তারা এসে পৌঁছতে পৌঁছতেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরলেন শীলা দেবী। দুরন্ত স্রোতের টানে তার লাশটা কোথায় ভেসে গেল সে সন্ধান আর কেউ পেলেন না।

এ ঘটনায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন গৌরী রানী। ধরাধরি করে সবাই তাকে প্রাসাদে আনলেও গৌরী রানীর কান্না আর থামলো না। তিনি অবিরাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এরপর খলিল পীর সাহেব গুরুদাসকে বললেন– এদিকে রাজা নিহত হওয়ার পর রাজ্যের ভার দেয়ার জন্যে রাজার ওয়ারিশ খুঁজতে গিয়ে শাহ সুলতান সাহেব ও আমরা জানতে পারলাম, রাজার একমাত্র ওয়ারিশ তার ভগ্নী শীলা দেবী। আর শীলা দেবী এখন প্রাসাদেই অবস্থান করছেন। একথা শুনে শাহ সুলতান সাহেব আমাকে আর ফৌজদার নূর মুহম্মদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ছুটে এলেন শীলাদেবীর হাতে রাজ্যের ভার তুলে দেয়ার জন্যে। প্রাসাদে এসে শীলা দেবীর খোঁজ করতেই তার সখী গৌরী রানী বেরিয়ে এলেন বাইরে। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে শাহ সুলতান সাহেবকে দেখামাত্র তিনি ভূত দেখারও অধিক চমকে উঠে বলতে লাগলেন– এ কি! এ কি!! আপনি জীবিত আছেন? সে কি, সে কি!!

গৌরী রানী থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। শাহ সুলতান সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিপুল শব্দে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন গৌরী রানী। বলতে লাগলেন– হায় হায় হায়! সেই আপনি এলেন, একটু আগে এলেন না কেন?

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– মানে?

গৌরী রানী কাঁদতে কাঁদতে বললেন– আপনি নিহত হয়েছেন এই ভুল সংবাদ শুনে সখী আমার নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন।

চমকে উঠলেন শাহ সুলতান সাহেব। বললেন– সেকি! আমি নিহত হয়েছি বলে উনি আত্মহত্যা করলেন কেন?

Boighar & BABD

আবার ডুকরে কেঁদে উঠে গৌরী রানী বললেন– তিনি যে আপনাকে তার নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভাল বেসেছিলেন হুজুর। তাই আপনি নিহত হয়েছেন শুনে তিনিও নিজের প্রাণটা বিসর্জন দিয়ে দিয়েছেন।

এরপর শাহ সুলতান সাহেবকে শীলা দেবীর ভালবাসার কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন গৌরী রানী। আদ্যোপান্ত বর্ণনা করার পর বললেন– এই সর্বনাশের জন্যে আমিই দায়ী হুজুর। আমার উৎসাহ আর সহায়তাতেই সখী আমার আপনাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবেসেছিলেন। এভাবে এমন ভালবাসা আর কেউ বোধ হয় কখনও বাসেনি।

গৌরী রানীর মুখে তামাম কাহিনী শুনার পরই শাহ সুলতান সাহেব পাহাড়ের মতো নিশ্চল হয়ে গেলেন। কথা বলার সকল সংবিত হারিয়ে ফেললেন তিনি।

খলিল পীর সাহেব এরপর গুরুদাসকে বললেন– শাহ সুলতান সাহেবকে নির্বাক দেখে গৌরী রানীর সাথে আমিই কথা বলতে লাগলাম। বললাম, সে কি! আপনিই তাকে ভালবাসতে উৎসাহিত করেছিলেন?

গৌরী রানী বললেন– আজ্ঞে আমিই। আমিই তাকে যার পর নেই উৎসাহিত করেছিলাম।

বললাম– বলেন কি! তিনি আপনার উপর এতটাই ভরসা রাখতেন?

বললেন– রাখতেন হুজুর, রাখতেন। তিনি শুধু অপরূপা সুন্দরীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন খুবই বড় মনের মানুষ। অত্যন্ত উদার আর অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। আমাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। আমরা দু'জন সব সময় চটুল আলাপ আর হাসিঠাট্টা করতাম। এই নিষ্ঠুর প্রাসাদে আমিই ছিলাম তার অবলম্বন আর অবসর বিনোদনের মাধ্যম।

একটু থেমে গৌরী রানী বললেন– হুজুর, এই সাহেব তাকে পেলে জীবনটা ধন্য হতো সাহেবের!

এসব কথায় বজ্রাঘাত লাগলো শাহ সুলতান সাহেবের দিলে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনি উন্মাদের মতো ছুটে গেলেন প্রাসাদের বাইরে। কোথায় গেলেন আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

গুরুদাসের কাছে এই পর্যন্ত বর্ণনা করে হাজী খলিল পীর সাহেব থামলে গুরুদাস প্রশ্ন করলো– তারপর হুজুর?

পীর সাহেব বললেন– তারপর আর কি? আমি, নূর মুহম্মদ সাহেব, তাঁর সৈন্যগণ, জাহাজের কর্মচারী, নাবিক– সবাই মিলে দশ বারো দিন যাবত মহাস্থানের সর্বত্র তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। তবু তাকে আর পাওয়াই গেল না। কেন যে তিনি এভাবে নিরুদ্দেশ হলেন, তাঁর জাহাজে আর ফিলে এলেন না– তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

গুরুদাস বললো– কারণটা এটাই হুজুর। উনি তাঁর স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের গ্রামে যখন তিনি এলেন, তখন দেখলাম, তিনি একজন স্মৃতিভ্রষ্ট লোক। অতীত তাঁর কিছুই মনে নেই।

: তাই হবে।

: তারপর হুজুর?

: অগত্যা নূর মুহম্মদ সাহেবকে সৈন্য-সামন্তসহ জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। আমার অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নূর মুহম্মদ সাহেব সবাইকে নিয়ে দেশের অভিমুখে জাহাজ ছেড়ে দিলেন আর দেশে চলে গেলেন।

: আপনি গেলেন না হুজুর?

: কি করে যাই? শাহ সুলতান সাহেবকে দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়ে আমি তাঁর সাথে বাংলাদেশে এসেছিলাম। সেই শাহ সুলতান সাহেবকে বাংলাদেশে ফেলে রেখে একা আমি কোন মুখে দেশে ফিরে যাই। তাই আমি বাংলাদেশেই রয়ে গেলাম।

: তারপর?

: তারপর দীর্ঘদিন তাঁকে বহু স্থানে খোঁজ করে ক্লান্ত হয়ে একদিন আমি চট্টগ্রামে এলাম। চট্টগ্রামে এসে সেদিন চট্টগ্রামের জাহাজ ঘাটের উপর ম্লান মুখে বসেছিলাম। আমার সুহৃদ শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের অনুরোধে আর উৎসাহে শেষমেশ নিজের দেশটা একবার দেখে আসার জন্যে তার জাহাজে উঠে পড়লাম। ভুল করে তুমিও সেবার এই জাহাজে এসে উঠলে!

: জি হুজুর, জি জি।

: সবশেষে এই যে আবার চট্টগ্রামে ফিরে যাচ্ছি। কাহিনী আমার এখানে শেষ গুরুদাস। আর বলার কিছুই নেই।

: আজব কাহিনী হুজুর, আজব কাহিনী। গুরুদাস ফের বললো– এ কি হুজুর! জাহাজ এত ধীরে ধীরে যাচ্ছে কেন? যাচ্ছে কি-না তা বোঝাই যাচ্ছে না।

Boighar & BABD

খলিল পীর সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন– শুধু এখনই নয় গুরুদাস, জাহাজ ছেড়ে দেয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই এই রকম ধীরে ধীরে যাচ্ছে। আবহাওয়া নাকি যার পর নেই খারাপ হয়ে গেছে।

: বলেন কি হুজুর! খবরটাতো তাহলে খুব খারাপ খবর।

: হ্যাঁ খুবই খারাপ খবর!

: কি বিপদ, কি বিপদ! তা হুজুর, আপনি বলেছিলেন, চট্টগ্রামে পৌঁছার আগেই কাহিনীটা শেষ করবেন। কাহিনী তো শেষ হলো হুজুর! চট্টগ্রাম আর কত দূরে?

খলিল পীর সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– আমি কিছুই বুঝতে পারছি না গুরুদাস! সমুদ্রের কোন স্থানে এখন আছি আমরা আর কখন জাহাজ চট্টগ্রামে পৌঁছবে, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

: তাহলে উপায়? আমরা কি কিছুই জানতে পারবো না?

: পারবো। জাহাজের চালককে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানা যাবে।

: আমি কি চালকের কাছে যাবো?

: তুমি?

: জি হুজুর? আপনি কষ্ট করার চেয়ে...

: না, তুমি বসো। আমি চালকের কাছে লোক পাঠিয়ে সব জেনে নিচ্ছি।

চালকের কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন পীর সাহেব।

কিছুক্ষণ পর চালকের এক সহকারী এসে পীর সাহেবকে বললেন– আমরা এখন সমুদ্রের কোনখানে আছি, সেটা জানতে চেয়েছেন হুজুর?

পীর সাহেব বললেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন আমরা সমুদ্রের কোনখানে আছি সেটা বলুন। চট্টগ্রামে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে, সেটাও বলুন।

চালকের সহকারী বললেন– চট্টগ্রামে তো অনেক আগেই পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল হুজুর! কিন্তু আবহাওয়াটা এত বেশি খারাপ হয়ে গেছে যে, এত খারাপ আবহাওয়া গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমি দেখিনি। তিন মাস সোয়া তিন মাসের মধ্যে চট্টগ্রামে পৌঁছার কথা ছিল আমাদের। অথচ সাড়ে- তিন মাস সময় পার হয়ে গেছে তবু সমুদ্রের প্রায় মাঝামাঝি স্থানেই আছি আমরা।

পীর সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– বলেন কি ভাই সাহেব! তাহলে চট্টগ্রামে পৌঁছতে আর কতদিন লাগবে?

Boighar & BABD

: দেড় মাস হুজুর। কমছে কম আরো দেড় মাসের আগে আমরা চট্টগ্রামে পৌঁছতে পারবো না।

: কি বদনসীব! আরো দেড় মাস?

: কমছে কম দেড় মাস হুজুর, আবহাওয়া আরো খারাপ না হলে দেড় মাসের মধ্যেই চট্টগ্রামে পৌঁছে যাবো আমরা।

: ইয়া আল্লাহ! কোন বিপদ আপদের সম্ভাবনা নেই তো ভাই সাহেব?

: জি-না হুজুর, জি-না। আমাদের চালক সাহেব খুব দক্ষ লোক। এর চেয়েও অনেক বেশি খারাপ আবহাওয়া ইতোপূর্বে গেছে। তবু ইনশাআল্লাহ কোন বিপদ-আপদ হয়নি।

: ও আচ্ছা।

: বেশি সময় লাগার জন্যে আপনাদের একটু তকলিফ হবে এই যা। এর বেশি কিছু নয়। অন্য ভয়ের কোন কারণ নেই।

: আলহামদুলিল্লাহ!

: আমি এখন আসি হুজুর?

: জি, আসুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হোন।

চালকের সহকারী চলে গেলেন। পীর সাহেব এবার গুরুদাসকে বললেন– কি বুঝলে?

গুরুদাস থতমত করে বললো– কোন কথা হুজুর? সময়ের কথা?

: হ্যাঁ সময়ের কথা।

: হুজুর!

: স্বাভাবিকভাবে আসা যাওয়া করলে মানে আরবে পৌঁছেই আবার ফিরে এলে, ছয়-সাড়ে ছয় মাস লাগার কথা। সেখানে আমাদের এ সফরে প্রায় এক বছর সময় লাগছে।

: এক ব-ছ-র!

: তার বেশি ছাড়া কম নয়।

: হুজুর!

: বৈরী আবহাওয়ার জন্যে আরবে গিয়ে পৌঁছতেই প্রায় এক মাস বেশি সময় লেগেছে। এরপর জাহাজে মাল নামতে তুলতে দুই মাস লেগেছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে ফিরে আসতে তিন মাসের স্থলে প্রায় পাঁচ মাস লাগছে।

মানে, আরো দুই মাস বেশি। এবার হিসেব করে দেখো, ছয়-সাড়ে ছয় মাসের জায়গায় প্রায় এক বছর লাগছে কি-না?

: ওরে বাপরে! কি বিপদ, কি বিপদ!

হাজী খলিল পীর সাহেব এবার কম্পিতকণ্ঠে বললেন– বিপদ বলে বিপদ! মহাবিপদ গুরুদাস, মহাবিপদ!

গুরুদাস শংকিতকণ্ঠে বললো– হুজুর!

: মিসমার হয়ে গেল। আমার সব আশা মিসমার হয়ে গেল। ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল।

: আশা! আশা মানে?

: আশা মানে, আমার আশা ভরসা– সম্ভাবনা সব। সব মরীচিকার মতো মিথ্যা হয়ে গেল গুরুদাস। বুঁদবুঁদের মতো মিলিয়ে গেল। হায় হায় হায়! শেষ পর্যন্ত এতটাই হতাশায় পড়তে হলো আমাকে! সম্ভাবনা বলে আর কিছুই রইলো না?

: সম্ভাবনা! কিসের সম্ভাবনা হুজুর?

: শাহ সুলতান সাহেবকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনা একদম শেষ হয়ে গেল!

www.boighar.com

: কেন হুজুর, শেষ হবে কেন?

: কেন হবে না? তুমি বলেছিলে শাহ সুলতান সাহেব তোমাদের গ্রামে নেই। তুমি এই জাহাজে উঠার কয়দিন আগে তিনি তোমাদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বলে ছিলে না?

: জি হুজুর, বলেছিলাম।

: জাহাজে উঠার আগে চট্টগ্রাম জাহাজ ঘাটের উপর থাকতে যদি এ খবর দিতে, তাহলে দৌড়াদৌড়ি করে গিয়ে আমি তোমাদের এলাকাতেই খুঁজে পেতে তাঁকে বের করতে পারতাম। কিন্তু খবরটা দিলে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ ছেড়ে দেয়ার পর।

তৎক্ষণাৎ খুঁজে দেখার জায়গায় পড়ে গেলাম ছয় মাস সাড়ে ছয় মাসের ধাক্কায়।

: হুজুর!

: তবুও একটা ক্ষীণ আশা বুকের মধ্যে ছিল আমার। চিন্তা করেছিলাম ছয় মাস সাড়ে ছয় মাস পরে গিয়ে খুঁজলেও তোমাদের এলাকাতে না হোক, তোমাদের কোন দূরবর্তী এলাকায় হয়তো তাকে খুঁজে পাবো আমি। কিন্তু সেখানে গোটা

Projghar & BARD
এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে তাঁকে খুঁজতে বেরোবো। আর কি তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে, বলো?

: তা মানে...

: তুমি বলেছিলে পূজো নেয়ার ভয়ে তিনি তোমাদের গ্রাম ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছেন। কাজেই, তোমাদের গ্রামে যে আবার ফিরে আসবেন উনি, সে সম্ভাবনা আর নেই। ঠিক কি-না?

: জি হুজুর, সেটা একদম ঠিক। যে রকম ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন উনি, তাতে আমাদের গ্রামে উনি আর কখনো আসবেন না।

: তাহলেই বুঝো, এক বছর পরে গিয়ে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি আছে! স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ। যাওয়ার নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। অজানা অচেনা পথে ঘুরতে ঘুরতে বিশাল বাংলাদেশের[১] কোন গভীরে গিয়ে ঢুকেছেন, কে জানে? আর কি তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

গুরুদাস ঢোক চিপে বললো– জি হুজুর, সে কথা অবশ্য ঠিক। নির্দিষ্ট কোন জায়গা না থাকলে কোথায় গিয়ে খুঁজবেন আপনি?

পীর সাহেব ফের কম্পিতকণ্ঠে বললেন– তবে? সেই জন্যেই তো বলছি গুরুদাস, আমার সব আশা-ভরসা শেষ। আর তাঁকে খুঁজে পাবো না। আজীবন খুঁজেও তাঁকে পাবো না।

পীর সাহেব আকুলি বিকুলি করতে লাগলেন। তা দেখে চিন্তা করতে করতে গুরুদাস ফের আশান্বিতকণ্ঠে বলে উঠলো– এমনও তো হতে পারে হুজুর, হঠাৎ উনি স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন আর দেশে ফিরে গেছেন?

খলিল পীর সাহেব মাথা তুলে বললেন– কী বললে? স্মৃতি ফিরে পেয়ে উনি দেশে ফিরে গেছেন?

: তা যেতেও তো পারেন হুজুর।

: এটা একটা একদম আষাঢ়ে গল্প।

: কেন হুজুর?

: তা গেলে তো তাঁর সাথে দেখা হতো আমাদের। প্রায় চার মাস অতিবাহিত করে আমরা আরবে পৌঁছলাম। মাল মাত্তা ওঠানামা করতে আরো দুই মাস কেটে গেল। অর্থাৎ বিগত ছয় মাসের মধ্যে উনি আরবে পৌঁছেননি! চট্টগ্রাম থেকে আমাদের জাহাজ ছেড়ে দেয়ার পরে পরেই উনার স্মৃতি ফিরে থাকলে

---

১. বাংলাদেশ তখন বিশাল অর্থাঃ গোটাই ছিল। দু'ভাগে বিভক্ত ছিল না।

Boighar & BABD

আর উনি দেশে রওনা হয়ে থাকলে, এই ছয় মাসের মধ্যে তো তাঁর আরবে পৌঁছার কথা।

: আগে না ফিরুক, পরে তো তাঁর স্মৃতি ফিরে থাকতে পারে হুজুর! উনি পরে রওনা দিয়েছেন!

: এসব অলিক কল্পনা। তবুও যদি তোমার কল্পনা সত্যি হয় আর উনি পরে রওনা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর জাহাজ এখন সমুদ্রের মাঝখানে আছে।

: কেন হুজুর, তা কেন?

: কেন নয়? স্মৃতি ফিরলে, স্মৃতি ফেরার সাথে সাথে তাঁর সর্বাগ্রে মনে পড়বে মহাস্থানে ফেলে রেখে আসা তাঁর জাহাজের কথা আর তাঁর লোকজনের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আগে তিনি সেখানে ছুটবেন। গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফের চট্টগ্রামে ফিরে আসবেন। এই হুটপাটেই তো কেটে যাবে তাঁর দুই তিন মাস।

: দুই তিন মাস! কেন হুজুর? এত সময় কেন?

: মহাস্থান কি হাতের কাছের জায়গা? বহু দূরের অর্থাৎ বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এক জায়গা। সেখানে যাওয়া আর সেখান থেকে আবার এই সুদূর চট্টগ্রামে ফিরে আসা কি দুই এক সপ্তাহের ব্যাপার? শাহ সুলতান সাহেবের সাথে জাহাজ নেই, নৌকা নেই, গাড়ি-ঘোড়া কিছুই নেই। অজানা অচেনা এই দুরূহ পথ অতিক্রম করতে দুই আড়াই মাস সময় তো লাগবেই।

: তাহলে?

: তাহলে আর কি! চট্টগ্রাম থেকে আরবে পৌঁছতে কমছে কম তিন মাস সাড়ে তিন মাস লাগে। পরে স্মৃতি ফিরলে কমপক্ষে দুই মাস কাল তাঁর কেটে যাবে ঐ মহাস্থানের ঝুট ঝামেলায়। হাতে থাকে দেড় মাস। এখন হিসেব করে দেখো, এই দেড় মাসে তাঁর জাহাজ সমুদ্রের অর্ধেক রাস্তার অধিক এগুতে পারে কি-না?

: জি হুজুর, তা ঠিক। তবে পরে তো তাঁর জাহাজ আরবে পৌঁছতে পারে হুজুর। মানে, পৌঁছবে?

: তোমার এই ধারণা নিছক একটা কল্পনা মাত্র। এর কোন বাস্তবতা নেই। এটা অসম্ভব।

: তবু অনেক অসম্ভবই তো সম্ভব হয় হুজুর। দৈবাৎ এই অসম্ভবটাও তো সত্য হয়ে যেতে পারে?

: সে সম্ভাবনা একশো ভাগের এক ভাগও নয়। তবে যে সত্যের সম্ভাবনা একশো ভাগের নিরানব্বই ভাগ, সে কথা মনে হতেই আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠছে গুরুদাস। আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে।

খলিল পীর সাহেব ফের কাঁপতে শুরু করলেন। তার চোখ মুখ কালো হয়ে যেতে লাগলো। গুরুদাস প্রশ্ন করলো– সেটা কি হুজুর! খলিল পীর সাহেব মুমূর্ষুকণ্ঠে বললেন– শাহ সুলতান সাহেব আর ইহ দুনিয়ায় নেই!

আঁতকে উঠলো গুরুদাস। আঁতকে-উঠে বললো– হুজুর! এ কী বলছেন! এ কী বলছেন?

: সেই সম্ভাবনাই একশো ভাগের নিরানব্বই ভাগ। একশো ভাগের একশো ভাগও হতে পারে গুরুদাস, সেটাও হতে পারে।

: হুজুর!

: স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ। কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই। অজানা অচেনা পথে ঘুরতে ঘুরতে অনাহারে অনিদ্রায়, ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে উনার পথে পড়েই মরে থাকার সম্ভাবনা প্রায় ঐ একশো ভাগ। এই এক বছর সময় ধরে এইভাবে ঘুরতে গিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।

: কি কথা, কি কথা!

: পারে বলো? বাঘ ভাল্লুকের পেটেও যেতে পারেন তিনি। পথ ভুলে বন-জঙ্গলে ঢুকলে, বাঘেও খপ করে খেয়ে ফেলতে পারে তাঁকে।

ফের আঁতকে উঠলো গুরুদাস। আওয়াজ দিলো– আহা!

পীর সাহেব বললেন– মোটকথা, এতদিন তাঁর বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমি তোমাদের দেশে গিয়ে আজীবন খুঁজলেও আর তাঁকে পাবো না। আমি নিশ্চিত, তিনি মারা গেছেন।

www.boighar.com

: ওহ্! কি নিদারুণ কথা!

: নিদারুণ নিদারুণ! আ-হা-হা! এ কি দূরবস্থায় ফেললে আমায় আল্লাহ! এ কি পরিণতি আমি সামনে দেখছি আমার। এ কি নিদারুণ পরিণতি!

গুরুদাস ফের সচকিত হয়ে উঠে বললো– আপনার পরিণতি! আপনার আবার কোন পরিণতির কথা বলছেন হুজুর?

: তাঁকে খুঁজে খুঁজে ঐভাবে আমিও পথে পড়েই মরে থাকবো গুরুদাস। ঠিকানাহীন পথে খুঁজে খুঁজে আমিও ঐভাবে পথে পড়েই মরে থাকবো।

আফসোসের আধিক্যে প্রবল বেগে কাঁপতে লাগলেন পীর সাহেব। টলে টলে পড়তে লাগলেন। তা দেখে গুরুদাস চমকে উঠে বললো– ওহ্ হো! আপনি তো পড়ে যাবেন হুজুর। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। সেবারের মতো আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আপনার জ্ঞান আর নাও ফিরতে পারে। শরীরের যা অবস্থা হয়েছে...!

খলিল পীর সাহেব অর্ধ-চৈতন্যের মতো প্রশ্ন করলেন– এ্যাঁ কি বললে?

: শুয়ে পড়ুন হুজুর, শুয়ে পড়ুন। আর কথা বলবেন না।

গুরুদাস তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলো। শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রান্ত-ক্লান্ত পীর সাহেব ঘুমিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

চট্টগ্রামে পৌঁছতে এইভাবে শুয়ে বসে খলিল পীর সাহেব আর গুরুদাসের সময় কাটতে লাগলো। অস্থির পীর সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়ে গুরুদাস বার বার বলতে লাগলো– আপনি ঈমানদার মানুষ হুজুর, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকুন। এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে যেন না পড়তে হয়, এই মর্মে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করতে থাকুন। আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনার আবেদন শুনবেন।

পীর সাহেব উদাসকণ্ঠে বললেন– এ্যাঁ! শুনবেন?

গুরুদাস বললো– অবশ্যই শুনবেন। আপনার মতো মানুষের আবেদন উনি না রেখে পারেন না।

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে পীর সাহেব বললেন– রাখুন আর না রাখুন, আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ পেশ করা ছাড়া আর কিছুই এখন করার নেই আমার। আর কিছুই করার নেই।

শুয়ে বসে আর আফসোস আহাজারির মধ্য দিয়ে দিন কাটতে লাগলো উভয়ের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঠিক দেড় মাসের মাথায় একদিন তাঁদের জাহাজ চট্টগ্রাম জাহাজ ঘাটে পৌঁছে গেল।

১০

জাহাজ এসে চট্টগ্রাম জাহাজ ঘাটে ভিড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজী খলিল পীর সাহেব আর গুরুদাস পড়ি মরি দ্রুত নেমে এলেন জাহাজ থেকে। অতঃপর জাহাজের মালিক শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের কাছে অতি অল্প কথায় বিদায় নিয়ে খলিল পীর আর গুরুদাস উভয়েই ছুটতে লাগলেন গুরুদাসের গ্রামের দিকে। গুরুদাসের দিল তখন দীর্ঘ এক বছরের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আর বাড়ি ফিরে আসার আনন্দে মাতোয়ারা। হাজী খলিল পীর সাহেবের দিল তখন আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান।

গুরুদাসের গ্রামে গিয়ে খলিল পীর সাহেব যে শাহ সুলতান সাহেবকে পাবেন না, সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। তবু তিনি গুরুদাসের সাথে গুরুদাসের গ্রামের দিকে ছুটছেন– ঐ স্মৃতিভ্রষ্ট আওয়ারা মানুষটার কিছুমাত্র হদিসও যদি তিনি সেখানে গিয়ে পান, এই আশায়।

গুরুদাস আগে আগে আর পীর সাহেব তার পিছে পিছে দ্রুত পদে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা উভয়েই পৌঁছে গেলেন গুরুদাসের বাড়িতে। পীর সাহেবকে সাথে নিয়ে গুরুদাস তার বাড়ির ভেতরে পৌঁছামাত্র মহা হুলস্থূল পড়ে গেল সেখানে। দীর্ঘ এক বছর পর গুরুদাসকে দেখে ভূত দেখার অধিক চমকে উঠলো লোকজন। প্রথমে তার দিকে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সবাই। এরপর শুরু হলো হৈ চৈ।

গুরুদাসের মা চিৎকার করে বলতে লাগলেন– ফিরে এসেছে, আমার গুরুদাস ফিরে এসেছে! জয় গুরু জয় গুরু। ওগো, তুমি কোথায় গেলে? শিগগির এসে দেখো, তোমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে বাড়িতে ফিরে এসেছে আবার। জয় প্রভু, জয় প্রভু! জয় শিব শম্ভু! জয় রাধা মাধব!

গুরুদাসের মা গুরুদাসের বাপকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। তার চিৎকারে শুধু গুরুদাসের বাপই নয়, বাড়ির অন্য সকলেই এসে জড়ো হলেন সেখানে।

শুরু হলো হরেক রকম উৎসুক প্রশ্ন– গুরুদাস এতদিন কোথায় ছিল, কেন সে বিদেশী জাহাজে গিয়ে উঠলো, তারপর জুলুম নির্যাতন চলেছে কিনা, তার জাত পাত আছে কিনা– ইত্যাদি ইত্যাদি।

Boighar & BABD

জাত পাতের প্রশ্নে গুরুদাস বললো– যা আমাকে ভাববে, আমি তাই। আমি অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান।

তার কথা শুনেই অন্য বাড়ির এক বিধবা মহিলা চমকে উঠে বললেন– রাম রাম রাম! মুসলমান?

গুরুদাস দীপ্তকণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, মুসলমান। আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান না হলেও আহারে চলনে আমি অর্ধেকটা মুসলমান।

বিধবাটি বললেন– সে কি! সে কি!

গুরুদাস বললো– আর সে কি! তোমাদের ঐ ঠুনকো জাতপাতের মূল্য আমি বুঝে গেছি! সত্য মিথ্যার ব্যাপারটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। আমি এবার আনুষ্ঠানিকভাবেই মুসলমান হবো।

বিধবাটি গালে হাত দিয়ে বললেন– মাগো মা! কি জাত যাওয়া কথা!

এরপর গুরুদাসের মাকে ডেকে বললো– ও দিদি, তোমার ছেলে এ বলে কি গো?

গুরুদাসের মা বললেন– যা বলে বলুক, যা হয় হোক। ওসব আমার কাছে বড় কথা নয়। ছেলে আমার ফিরে এসেছে– এইটেই বড় কথা। ছেলে আমার বেঁচে থাক, এইটেই বড় কথা। মুসলমান হয়ে গেলেও সুরমার বাপ-মায়েরা কত খুশি আজ। জাত পাত নিয়ে ওরা মোটেই ভাবে না। আমি ভাবতে যাবো কেন?

চোখ কপালে তুলে বিধবাটি বললেন– মাগো মা! কালে কালে আর কতই দেখবো!

গুরুদাসের বাপ ধমক দিয়ে বললেন– আহ! তোমরা থামো তো! আমাকে অন্য কথা জানতে দাও...! বলেই গুরুদাসকে বললেন– তা বাবা গুরুদাস, তোমাকে ওরা মারধর করেনি তো? ঐ জাহাজের লোকেরা?

গুরুদাস বললো– শুধু মারধর নয় বাবা, জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আমাকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল জাহাজের লোকেরা।

এরপর একপাশে দণ্ডায়মাণ খলিল পীর সাহেবকে দেখিয়ে দিয়ে গুরুদাস বললো– কিন্তু এই হুজুরের হস্তক্ষেপের দরুন মেরে ফেলা তো দূরের কথা, একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগেনি আমার গায়ে। এই হুজুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের মতো আগলে রেখেছিলেন আমাকে। অত্যন্ত উচ্চমানের খাবার খাইয়ে আর অত্যন্ত আরামপ্রদ বিছানায় শোয়ায়ে বসায়ে নিজের কক্ষে নিজের কাছেই আমাকে রেখেছিলেন বরাবর।

এতক্ষণে পীর সাহেবের উপর নজর পড়লো সকলের। গুরুদাসের বাপ বললেন– এই হুজুর? এই হুজুর তোমার জন্যে এতটাই করেছেন?

: আজ্ঞে বাবা, এতটাই করেছেন। অনেকের আপন ভাইও এতটা করে না।

: আহা! কল্যাণ হোক, হুজুরের কল্যাণ হোক। তা ইনি বুঝি ঐ আরব দেশের লোক?

: হ্যাঁ বাবা, আরব দেশের।

: তোমাকে পৌঁছে দিতে এখানে এসেছেন বুঝি?

: হ্যাঁ, পৌঁছে দিতেই আর কি। তবে একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে হুজুর এখানে এসেছেন।

: উদ্দেশ্য? সেটা কি গুরুদাস?

: বলছি বলছি। আচ্ছা বাবা, সুরমাদের বাড়ি থেকে ঐ যে ঐ স্মৃতি হারানো সুরতান সাহেব পূজো নেয়ার ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন, কোথায় গেলেন বা কোন দেশে গেলেন, সেসব কিছু কি জানতে পেরেছেন আপনারা?

গুরুদাসের বাপ বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন– কোন দেশে মানে?

গুরুদাস বললো– মানে, কোথায় বা কোন এলাকায় থাকতে পারেন উনি এখন– এমন কি কোনো ধারণা আছে আপনাদের?

: সে কি! তুমি কার কথা বলছো? সুরতান সাহেবের?

: হ্যাঁ বাবা, তার কথাই বলছি।

: তাহলে কোথায় বা কোন এলাকায় থাকতে পারেন, একথা বলছো কেন? উনি তো এখানেই আছেন।

চমকে উঠলো গুরুদাস। নিজ কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। চমকে উঠে বললো– এখানেই মানে? কি বলছেন আপনি?

: বলছি, সুরমাদের ওখানেই বউ-বাচ্চা নিয়ে পৃথক বাড়িতে আছেন।

: বউ-বাচ্চা নিয়ে! উহ! কি গোলমেলে কথা! কার কথা বলছেন? কে কার বউ?

: আরে, সুরতান সাহেবের কথাই বলছি। ও বাড়ির সুরমাই তো বউ তাঁর। সুরমা মুসলমান হয়ে ঐ মুসলমান সুরতান সাহেবকে বিয়ে করেছে। তাদের একটা বাচ্চাও হয়েছে।

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে গুরুদাস বললো– কি তাজ্জব, কি তাজ্জব! সুরমাকে বিয়ে করেছেন আর তার বাচ্চাও হয়ে গেছে এর মধ্যে? কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! এত অল্প সময়ে এত কাণ্ড!

গুরুদাসের বাপ বললেন– আশ্চর্য হবার কি আছে? তুমি হারিয়ে যাওয়ার দুই তিন দিন পরেই হরিদাসেরা গিয়ে খুঁজে আনে সুরতান সাহেবকে। সুরতান সাহেবকে বিয়ে করতে না পেরে মরতে বসেছিল সুরমা রানী। তাই হরিদাসেরা সুরতান সাহেবকে ধরে আনার সঙ্গে সঙ্গেই সুরমার বাপ মায়েরা তাঁর সাথে বিয়ে দেয় সুরমার। সেই মাসেই বাচ্চা আসে সুরমার পেটে।

: মার কাটারি! এ যে গল্প কাহিনীকেও হার মানিয়ে দিলো! বলেই গুরুদাস খলিল পীরকে উদ্দেশ্য করে বললো– কেল্লা ফতে হুজুর, কেল্লা ফতে! আল্লাহ তায়ালা আপনার আরজ ঠিকই মঞ্জুর করেছেন। সুরতান সাহেব, মানে শাহ সুলতান সাহেব এখানেই আছেন। এই পাশের বাড়িতেই।

হাজী খলিল পীর সাহেব এঁদের কথাবার্তা থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন শাহ সুলতান সাহেব জীবিত আছেন আর এখানেই আছেন। অনুমান করার পর থেকেই তিনি আনন্দে ও আবেগে থর থর করে কাঁপছিলেন। গুরুদাসের কথায় তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ! ওহ! কি খোশ খবর, কি খোশ খবর! তুমি তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দাও গুরুদাস, আমি আমার আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি। আমি আমার আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ দিই। লাখো লাখো ধন্যবাদ দিই তাঁকে।

: অবশ্যই অবশ্যই। তা এখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন, না ওখানেই আগে যাবেন হুজুর?

: ওখানেই, ওখানেই। এরপর কি বিশ্রাম নেয়ার আদৌ কোন প্রশ্ন আসে গুরুদাস? চলো চলো, আমাকে ওখানেই আগে নিয়ে চলো! জলদি...

পীর সাহেবের ব্যস্ততার প্রেক্ষিতে গুরুদাস পীর সাহেবকে নিয়ে ওখানেই আগে ছুটলো। গুরুদাসের পিতা-মাতারাও অনুসরণ করলেন তাঁদের।

বাড়ির বারান্দায় বসে পুত্র হাতিমের দোলনায় দোল দিচ্ছিলেন সুরতান, তথা শাহ সুলতান সাহেব। তাঁর স্ত্রী সুরমা বিবিও পাশে বসে 'দোলে দোলে' বলে ইশারায় কথা বলছিলেন ছেলের সাথে। এই সময় সেখানে সরবে এসে হাজির হলো গুরুদাস। পীর সাহেবের প্রতি ইংগিত করে সে শাহ সুলতান সাহেবকে আবেগভরে বললো– এই যে দাদাবাবু, দেখুন দেখুন, কাকে এনেছি! দেখুন...!

Boighar & BABD
শাহ সুলতান সাহেব চোখ তুলে চাইতেই পীর সাহেব তাঁর সামনে ছুটে এসে বললেন– সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! আপনি বেঁচে আছেন জনাব! আপনি এখানে আছেন?

পীর সাহেবের কথায় তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন শাহ সুলতান সাহেব। পীর সাহেব বললেন– চিনতে পারছেন না জনাব? আমি খলিল পীর। হাজী খলিল পীর।

শাহ সুলতান সাহেব উদ্ভ্রান্তকণ্ঠে বললেন– খলিল পীর!

: আপনার প্রতিবেশী খলিল পীর জনাব। আপনার বলখ রাজ্যের রাজপ্রাসাদের পাশেই আমার বাড়ি!

: বলখ রাজ্য!

: জি জি। আরবের বলখ রাজ্য। আপনি যে রাজ্যের রাজা, সেই বলখ রাজ্য। আপনি কি ভুলে গেছেন সব কিছু?

শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। ঘুরতে লাগলো শাহ সুলতান সাহেবের মাথা। তিনি অস্ফুটকণ্ঠে বললেন– বলখ রাজ্য! বলখ রাজ্যের রাজা!

: জি। আপনি সেই বলখ রাজ্যের রাজা। মসনদ থেকে নেমে আপনি সুফী হয়ে গেলেন। দামেশকের সুফী শ্রেষ্ঠ শেখ তওফিক সাহেবের নির্দেশে আপনি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে এলেন! মনে পড়ছে এসব কিছু?

আরো জোরে ঘুরতে লাগলো শাহ সুলতান সাহেবের মাথা। তিনি বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন– দামেশ্‌ক! ইসলাম প্রচার!

: হ্যাঁ। মাছের আকৃতি বিশিষ্ট জাহাজে চড়ে আমাকে নিয়ে বাংলাদেশে এলেন, সৈন্য দলসহ ফৌজদার নূর মুহম্মদ সাহেবকেও সাথে নিলেন আপনি?

: ফৌজদার নূর মুহম্মদ!!

: জি জি। এসব কি কিছুই মনে পড়ছে না জনাব? মহাস্থানে রাজা পরশুরামের সাথে আমাদের যুদ্ধ হলো। রাজা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হলেন। রাজার ভগ্নী শীলাদেবী নদীতে ডুবে প্রাণ দিলেন...!

: শীলাদেবী!

: শীলাদেবী, শীলাদেবী। তার ভালবাসা আর ডুবে মরার কথা শুনে আপনি স্মৃতি হারিয়ে ফেললেন। বরাবর আমি আপনার সাথেই ছিলাম...!

শাহ সুলতান সাহেব এবার উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন– এ্যাঁ! কে? কে? কে আপনি?

Boighar & BABD

: আমি খলিল পীর। বলখ রাজ্যে আপনার বাড়ির পাশেই আমার বাড়ি।

: খলিল পীর? আলহাজ খলিল পীর? সোবহান আল্লাহ, সোবহান আল্লাহ! এ আমি কোথায়, এ আমি কোথায়?

এবার গুরুদাস বললো– আপনি বাংলাদেশে দাদাবাবু। আপনার স্ত্রী সুরমা বিবির পাশেই বসে আছেন আপনি।

: সুরমা বিবি!

: আমাদের দিদিমণি সুরমা রানী!

এবার সুরমা বিবি বলে উঠলেন– সে কি জনাব? আমাকেও আবার ভুলে গেলেন নাকি?

: এ্যাঁ! সুরমা?

সুরমা বিবির দিকে তাকিয়ে বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। সুরমা, আমার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা বিবি ফের বললেন– ঐ তো আপনার ছেলে হাতিমের দোলনায় আপনি দোল দিচ্ছিলেন, খেয়াল করতে পারছেন না?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, হাতিম। আমার ছেলে হাতিম, আমার ছেলে হাতিম।

পীর সাহেব বললেন– মনে পড়ছে জনাব। এখনকার আর অতীতের সব কিছু মনে পড়ছে?

: পড়ছে পড়ছে। সব মনে পড়েছে আমার। এদের কথা, দেশের কথা, সব মনে পড়েছে।

www.boighar.com

: আপনার দেশের কথা মনে পড়েছে আপনার?

: পড়েছে পড়েছে। আমার রাজ্য, রাজধানী– সব মনে পড়েছে। তা কেমন আছেন আমার উজির শেখ আবদুল্লাহ চাচাজান? কেমন আছেন তিনি? তিনি কি সহিসালামতে আছেন? বলতে বলতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শাহ সুলতান সাহেব এবং পীর সাহেবকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– খলিল পীর সাহেব, আমার পরম বান্ধব হাজী খলিল পীর সাহেব! আপনি সহি-সালামতে আছেন তো? আপনার খবর ভালো তো?

আলিঙ্গন মুক্ত হতে হতে খলিল পীর সাহেব বললেন– জি জি। আমি ভাল আছি জনাব। আপনার রাজ্যের সকলেই সহি-সালামতে আছেন। এরই মধ্যে আমি একবার দেশে গিয়েছিলাম। দেশ থেকে এইমাত্র ফিরে এলাম। আমি সব জেনে

এসেছি। আপনার উজির সাহেব, দরবারের সভাসদেরা, আপনার প্রজারা– সকলেই সহি-সালামতে আছেন।

Boighar & BARD

: আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। নূর মুহম্মদ সাহেবেরা এখন তাহলে কোথায়?

: মহাস্থান থেকেই উনারা সবাই দেশে ফিরে গেছেন।

: আলহামদুলিল্লাহ – আলহামদুলিল্লাহ!

মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে গোলমাল শুনে ছুটে এসেছিলেন সুরমার পিতা-মাতা। ছুটে এসেছিল তাঁদের দাসদাসীরাও। এঁদের কথাবার্তা শুনে সুরমার পিতা বিভ্রান্ত কণ্ঠে পীর সাহেবকে বললেন– রাজ্য, রাজা, উজির, প্রজা– এসব কি বলছেন আপনি? কে রাজা?

প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে খলিল পীর সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন– আপনি! আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

জবাব দিলো গুরুদাস। সে সঙ্গে সঙ্গে বললো– ইনি এই রাজা শাহ সুলতান সাহেবের শ্বশুর হুজুর! রাজা বাহাদুরের শ্বশুর।

খলিল পীর সাহেব সসম্ভ্রমে বললেন– আদাব আদাব। রাজা আপনারই জামাই! আপনার জামাই সুরতান সাহেবের আসল নাম শাহ সুলতান সাহেব। এই শাহ সুলতান সাহেব এক মস্তবড় রাজ্যের রাজা। এক সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজা।[১]

সুরমার পিতা বিহ্বলকণ্ঠে বললেন– সমৃদ্ধ রাজ্য! কোথা সে রাজ্য?

: আরব দেশে। আরব দেশের বলখ রাজ্য নামের এক সম্পদশালী রাজ্যের রাজা আপনার জামাতা।

: কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! এত বড় একজন মানুষ এখানে এ অবস্থায় পড়ে আছেন?

: সবই স্মৃতি হারানোর ব্যাপার মুরুব্বী। স্মৃতি হারানোর ফলেই অতীত জীবন তাঁর স্মরণ ছিল না আর তাই এখানে এভাবে থাকতে তাঁর অসুবিধা হয়নি।

: হায় ভগবান! এ কি তোমার লীলা! তা জামাই আমার স্মৃতি হারালেন কিভাবে?

: এটা একটা মস্ত বড় কাহিনী মুরুব্বী। এক তরফা এক অন্ধ প্রেমের কাহিনী।

---

১. সম্রাট বা সুলতান না বলে এদের বোঝার সুবিধার্থে পীর সাহেব এদেরকেও 'রাজা' বললেন।

Boighar & BABD
অতঃপর হাজী খলিল পীর শীলাদেবীর এক তরফা ভালবাসার কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে গেলেন। এরপর বললেন– অত্যন্ত রূপসী শীলাদেবীর এই বাঁধভাঙ্গা ভালবাসার কথা শাহ সুলতান সাহেব যদি আগে জানতে পারতেন আর শীলাদেবীকে স্বচক্ষে দেখতে পেতেন, তাহলে ঘটনাটা অন্যরকম হতো মুরুব্বী। শীলাদেবী নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করার ফলেই এই রাজা শাহ সুলতান সাহেব রূপসী শীলাদেবীর রূপ নিজ চোখে কখনো দেখতে পেলেন না। আর তার এক তরফা ভালবাসার কথা শোনার পর প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও শীলাদেবীকে শাদি করতে পারলেন না। ভুল সংবাদে শীলাদেবীর ঐ আত্মত্যাগ ভীষণভাবে রাজা বাহাদুরের দিলে আঘাত করেছিল। আর তারই ফলে তিনি স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

কাহিনী শুনে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সুরমা বিবির বাপ বললেন– কি বিচিত্র! কি বিচিত্র ব্যাপার স্যাপার!

খলিল পীর সাহেব বললেন– এই বিচিত্র ব্যাপার স্যাপার না ঘটলে অর্থাৎ আপনার জামাতা স্মৃতি হারিয়ে না ফেললে, তিনি আপনাদের গ্রামে আসতেনও না আর আপনার কন্যার সাথে তাঁর শাদিও হতো না। তিনি শীলাদেবীকে শাদি করতেন আর শীলাদেবীকে নিয়ে ঐ মহাস্থান থেকেই তাঁর দেশ আরবে ফিরে যেতেন। আরব দেশে চলে যেতেন।

এবার সুরমার মা শঙ্কিতকণ্ঠে বললেন– আরব দেশে ফিরে যেতো? মহাস্থানে থাকতো না?

: তাই কি থাকে? নিজের রাজ্য রাজত্ব ফেলে কি আজীবন কেউ ভিন দেশে পড়ে থাকে?

: ওমা! সে কি! আমার মেয়ে নাতিকেও তো তাহলে সে আরব দেশে নিয়ে যাবে!

: সেটাই তো স্বাভাবিক মা জননী। আপনার মেয়ে একজন রাজরানী, আপনার নাতি রাজপুত্র! রাজ্য রাজপ্রাসাদ ফেলে কি তাঁরা এই গৈ-গেরামে পড়ে থাকবেন? রাজা বাহাদুরও তাদের এখানে ফেলে রাখবেন কেন?

: ওমা, সে কি কথা! ওমা সুরমা, বুঝতে পারছো কিছু? জামাই তোমাদের এখান থেকে আরব দেশে নিয়ে যাবে, তা কি কিছু বুঝতে পারছো?

www.boighar.com

সুরমা বিবি বললেন– বুঝতে পারছি মা। আপনার জামাই যে আরব দেশের এক রাজ্যের রাজা, এ ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই তা বুঝতে পেরেছি আমি। কিন্তু...

সুরমার মা বললেন– কিন্তু কি?

: আপনার জামাই যদি এখানে না থেকে নিজ দেশে ফিরে যেতে চান, যাবেন। আমি আমার এই বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাবো না।

খলিল পীর সাহেব বললেন– তা না গেলে চলবে কেন বহিন? আপনার ছেলে রাজপুত্র। পিতার অভাবে তাকেই তো রাজা হতে হবে। পিতার সিংহাসনে তাকেই তো বসতে হবে।

: তা বড় হওয়ার পর ছেলে যদি তাই মনে করে, তা হলে তখন সে যাবে। এখন আমি ছেলেকে ছেড়ে দেবো না।

: এ তো মুশকিলের কথা। –বলেই পীর সাহেব শাহ সুলতান সাহেবকে বললেন– আপনার বেগম এ কি বলেন জনাব?

শাহ সুলতান সাহেব এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তিনি এবার হাসিমুখে বললেন– আমার বেগম যা বলবেন তাই হবে পীর সাহেব। আমার বেগম এই সুরমা বিবি আমার বড়ই দুর্দিনের বান্ধব। ইনি না থাকলে, আমি এঁদের এই সরোবরের ঘাটেই মরে পড়ে থাকতাম। এই সুরমাই মুমূর্ষু আমাকে ঘাট থেকে তুলে এনে প্রাণঢালা সেবাযত্ন দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছেন!

: জনাব!

: এরপর এই সুরমার ভালবাসার চাপে পড়েই আমি এখান থেকে যাওয়ার পর মুমূর্ষু অবস্থায় পথে পড়ে থাকাকালে আমাকে পথ থেকে তুলে আনা হয়েছে আর আমাদের শাদি দেয়া হয়েছে। সুরমা বিবির কাছে আমি আকণ্ঠ ঋণী। কাজেই সুরমা বিবির ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কোন কথা নেই। তিনি যা বলবেন, সেটাই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এক সাথে বলে উঠলেন– সাবাশ সাবাশ! এ না হলে রাজা! এ না হলে মহৎপ্রাণ!

সুরমার বাপ বললেন– দীর্ঘজীবী হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও!

শাহ সুলতান সাহেব বললেন– এসব কথা এখন থাক আব্বাজান। আমার সুহৃদ এই পীর সাহেব সুদূর আরব দেশ থেকে ক্লান্ত হয়ে এখানে এসেছেন। পীর সাহেবের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মেহমান হয়ে এই হাজী খলিল পীর সাহেব এখানে বেশ কিছুদিন থাকুন, তারপর অন্যসব কথাবার্তা।

গুরুদাস বললো– ঠিক ঠিক। এইটেই আসল কথা। এক্ষণে আমাদের বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন। আমি যাই, আপনারা হুজুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন।

Boighar & BABD
গুরুদাস তার বাড়িতে চলে গেল। শাহ সুলতান সাহেব আর তাঁর বিবি চাকর চাকরানী নিয়ে হাজী খলিল পীর সাহেবের বিশ্রামের সুব্যবস্থা করায় মনোনিবেশ করলেন।

কয়েকদিন কেটে গেল। এরপর একদিন এক আনন্দঘন মুহূর্তে শাহ সুলতান সাহেব সুরমা বিবিকে বললেন– তাহলে কি তুমি কোনদিনই তোমার স্বামীর দেশটা দেখতে যাবে না বেগম?

সুরমা বিবি বললেন– তা যাবো না কেন? আপনি আগে যান। আপনার রাজ্য, রাজত্ব, মসনদ, দরবার– এসব ঠিকঠাক করুন গিয়ে আগে। তারপর আপনি এসে নিয়ে গেলে ছেলেসহ আমি অবশ্যই আপনার দেশে যাবো আর সেখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে আসবো। কিন্তু স্থায়ীভাবে নয়।

শাহ সুলতান সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন– তথাস্তু বেগম! এতেই আমি মহাখুশি। স্থায়ীভাবে তুমি তোমার এই দেশেই থেকো। আমিও মাঝে মাঝেই আসবো তোমাদের এই বাংলাদেশে আর দেখে যাবো আমার স্ত্রী পুত্রকে।

: সোবহান আল্লাহ! আমিও তাহলে মহাখুশি হবো জনাব। আপনাকে মাঝে মাঝে দেখতে পেলে আমিও মহাখুশি হবো।

: পাবে, অবশ্যই পাবে। আমি মাঝে মাঝেই আসবো। তবে আমি ওখানে ঐ রাজপ্রাসাদে থাকবো আর আমার বেগম আমার পুত্র নিয়ে গৈ-গেরামের এই কুঁড়ে ঘরে থাকবেন, এটি কভ্ভি নেহি হোগা। এখানেও ঐ রকমই একটা অট্টালিকা গড়ে দেবো আমি। এবার আমি যাই। আবার যখন আসবো, এখানে একটা সুরম্য বাসভবন গড়ার মতো অর্থকড়ি হাতে নিয়েই আসবো আমি।

সুরমা বিবি বললেন– সোবহান আল্লাহ! কি খোশ খবর, কি খোশ খবর! পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আপনার সহায় হোন!

অতঃপর একদিন সবার কাছে বিদায় নিয়ে এবং স্ত্রী-পুত্রকে হৃদয় ঢেলে আদর সোহাগ করে হাজী খলিল পীরসহ স্বদেশের পথে পা বাড়ালেন রাজা বাহাদুর শাহ সুলতান সাহেব।

আলহামদুলিল্লাহ!!

www.boighar.com

স মা প্ত

www.boighar.com